বাংলায় মুসলিম জাগরণে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান

গবেষক

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তারিখঃ ১৫ জানুয়ারী - ২০১৫

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলায় মুসলিম জাগরণে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভখানা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোণামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তারিখঃ ১৪-০১-২০১৫ ইং

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য আবদুল্লাহ আল মাহমুদ কর্তৃক **"বাংলায় মুসলিম জাগরণে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর অবদান"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে গবেষক এ অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি। আমি এ গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত পান্ডুলিপি পড়েছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশপ্রেম, বিদ্যাবত্তা, সমাজ হিতৈষণা ও কর্মচাঞ্চল্যে যে কয়জন মনীষীর অবদান বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে বিশেষ গুরূত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী অগ্রগণ্য। পর্যাপ্ত গবেষণার অপ্রতুলতার কারণে এই মনীষীর ইতিহাস প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। বক্ষমাণ গবেষণা কর্মটিতে জাতীয় ইতিহাসের অনন্য সাধারণ এই মনীষীর সংগ্রামমুখর জীবনালেখ্য তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জাগরণের গতিপথ নির্ণয়; এই জাগরণে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর আজীবনের দেশ সেবা, তাদের পুনর্জীবন লাভের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার অক্লান্ত সাধনা এবং কল্যাণমুখী কর্মযজ্ঞ কতটা প্রভাবিত ও উদ্দীপিত করেছে সেই বিষয়টি তুলে ধরা।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা নির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীর সানুগ্রহ মূল্যবান পরামর্শে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না।

এই গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও এর মাইক্রোফিল্ম বিভাগ , পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার , বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। ইতিহাস গবেষক অনেকের গবেষণা সমৃদ্ধ বাংলার মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থরাজি থেকে যারপর নেই উপকৃত হয়েছি। আমি তাদের নিকট ঋণ স্বীকার করছি।

আমার উচ্চ শিক্ষা লাভে যিনি আমাকে সবচেয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার মরহুম পিতা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম আজ ইহজগতে বেঁচে থাকলে এই শুভ মুহূর্তে তিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন এই দু'আ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সকল কাজের মতো এই গবেষণা কাজেও স্নেহময়ী মাতা মেহেরুন্নেছার আন্তরিক দু'আ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এতদসঙ্গে শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মতিন খানের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রধান মুহাদ্দিস শাইখ নজরুল ইসলামের উৎসাহ ও প্রেরণা দানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণা কর্মটিকে আলোর মুখ দেখাতে সবচেয়ে যিনি সহযোগিতা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী সাফিয়া ইসলাম। এতদসঙ্গে স্নেহের কন্যা মাহদিয়া মুসতাবশিরা ও পুত্র আম্মার আল মাইমানও আমাকে প্রেরণা দিতে চেষ্টা চালিয়েছে। স্নেহের জহিরুল ইসলাম, তারিক আব্দুল্লাহ ও আসিফ আব্দুল্লাহ কম্পোজের কাজসহ গবেষণার কাজের জন্য সহযোগিতা করতে গিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে ঋণী করে রেখেছে। স্নেহের ছোট ভাই ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন সুদূর লন্ডন থেকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল হাফিজও আমার গবেষণা কাজের সাফল্য কামনায় উদগ্রীব থেকেছে। আমার অন্যান্য ভাই বোন ও আত্মীয়- শুভানুধ্যায়ী যারা আমার সফলতায় সদা উৎসুক আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই গবেষনা কাজটিকে কবুল করেন।

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলিম জাগরণে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান

কালের সন্ধিক্ষণে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যারা জ্ঞান বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য, ধর্মীয় জাগরণ ও সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়নে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন; লেখনী, গবেষণা ও সৃজনশীলতা দ্বারা নব উদ্যম ও অনুপ্রেরণায় জাতিকে উজ্জীবিত করেন, তারাই জাতির দিকপাল, পথিকৃত, শ্রদ্ধেয় ও বরণীয় বক্তিত্ব। মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন তেমনি বাঙালী মুসলমানদের চেনতা ও ঐতিহ্যের অগ্রদূত, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, নিঃস্বার্থ সমাজ হিতৈষী ও সংস্কারক এবং আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী ১৮৮৬ মতান্তরে ১৮৮৮ খৃ. বর্ধমান জেলার টুব গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল হাদী ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর মাতার নাম উম্মু সালমা।

শৈশবে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অধীনে লালবাড়ি মাদরাসায় পিতার সান্নিধ্যে ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব নাবীনা দেহলবীর নিকট। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উত্তর ভারতের কানপুর জামেউল উলুম মাদরাসায় ধর্মীয় বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানগণ যখন রাজনৈতিক ভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল এবং অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও কু-শিক্ষার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, বিশেষত মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগিতর পথকে রুদ্ধ করে দিয়ে তাদের জীবন যাত্রাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, ঠিক সে সময় বাংলার মুসলমানদের আলোর দিশারী রূপে যে কয়জন মহান কর্মবীর গৌরবময় ইতিহাস রচনা করে গেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী অন্যতম।

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী মুসলিম সমাজের জড়তা ও দুর্দিন দেখে যারপর নেই ব্যাথিতচিত্ত হন। মুসলমান জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তদানিন্তন দেবরেণ্য আলিম ও নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭৫-১৯৫০), ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখের সহযোগিতায় তিনি 'আঞ্জুমান উলামায়ে বাঙালা' (১৯১৩) গঠন করে ব্যাপক উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য দেখান।

জাতির সার্বিক কল্যাণ চিন্তায় তিনি ছিলেন একান্ত নিবেদিতপ্রাণ। বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করতে ১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলনের সূচনা যারা করেছিলেন তাদের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। সেই খেলাফত আন্দোলনই আযাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়ে উপমহাদেশের আকাশ বাসাতকে আলোড়িত করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে ১৯৪৭ সালে আযাদীর স্বপ্ন পূরণ হয়।

তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িত হয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে আরও একবার জেল ভোগ করতে হয়েছিল।

শেষবার জেল হতে বের হয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন, এবং দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাপার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৪৩ খৃ. মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ খৃ. তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিভাগপূর্ব বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নিঃস্বার্থ দেশসেবার জন্য তিনি সকল মহলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সংগ্রামী অবদানেই পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ মূলক প্রস্তাব ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে কুরআন ও সুন্নাহকে পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়ার কথা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি চর্চার পাশাপাশি ধর্মীয় কার্যক্রম এবং সাহিত্য চর্চায় তিনি ব্যপৃত থাকতেন। ১৯২৯ খৃ. বগুরা জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স ও ১৯৩৫ খৃ. রংপুর জেলার হারাগাছে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। 'আল এসলাম' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধরাজি ইসলামী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

অক্লান্ত জ্ঞানসাধক মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। দর্শন ও ইতিহাস শাস্ত্রের তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী পাঠক।

গৌরবময় কর্মজীবন শেষ করে ১৯৫২ সালের ১ ডিসেম্বর মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী মৃত্যু বরণ করেন। দিনাজপুরে নুরুল হুদা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে পিতা মাতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত এই মনীষীর জীবন ও কর্ম জানার মাধ্যমে আমরা অধিকতর দেশ প্রেমের স্বাক্ষর রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবো।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
ভূমিকা	০১
প্রথম অধ্যায় ঃ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর সমকালীন বাংলার অবস্থা	০৪
সমাজ	০৪
রাজনীতি	১৮
অর্থনীতি	৫৪
ধর্ম	৬৭
শিক্ষা	৮১
সাহিত্য	৯৩
সংস্কৃতি	১০২
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মাওলানা বাকীর প্রাথমিক জীবন	১০৬
জন্ম ও বংশ পরিচয়	১০৬
শৈশব ও শিক্ষা জীবন	১১২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাওলানা বাকীর কর্ম জীবন	১১৩
ইসলাম প্রচার	১১৩
সমাজ হিতৈষী মাওলানা বাকী	১১৯
রাজনৈতিক জীবন	১২২
আব্দুল্লাহিল বাকীর নিজ জেলা দিনাজপুরের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	১৩২
আব্দুল্লাহিল বাকীর সাহিত্য চর্চা ও লেখনী	১৪০
ধর্ম চিন্তা ও সমাজ সংস্কার	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ১৫৮
আহলে হাদীস আন্দোলনে মাওলানা বাকী ১৫৮
সমসাময়িক মনীষীগণ ও মাওলানা বাকীর তুলনা ১৬০
মনীষীগণের দৃষ্টিতে মাওলানা বাকী ১৬৭
পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণে মাওলানা বাকীর অবদান মূল্যায়ন ১৭৯
উপসংহার ১৮৪
পরিশিষ্টঃ ১ জীবনপঞ্জি ১৮৬
পরিশিষ্টঃ ২ মাওলানা বাকী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ছবি ১৮৮
গ্রন্থপঞ্জি ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একটি সমাজের গতিপথ নির্নয় করে দেয় সমাজ সচেতন কিছু মানুষ; যাদের জীবন ব্যাপী সাধনার বলে সমাজ ও জাতি সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে। বাংলার মুসলমানদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে ব্যাপক জাগরণ ঘটিয়ে যে সকল মনীষী তাদেরকে উন্নতির সোপান স্পর্শ করিয়েছে তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর নাম অগ্রগন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে জাতির এক সময়ের কাণ্ডারী এই মনীষীর সম্পর্কে আজও পর্যন্ত কোন গবেষণা হয়নি। সেই ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যেই এই গবেষনা কর্মের অবতারণা।

গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তার একটি চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে সমকালীন মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাকার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

১৭৫৭ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের মুসলমানগণ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন হয়ে যায় এবং কোম্পানীর গৃহিত চীরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । এর নিদারুন বাস্তবতা এতটাই কঠিন ছিল যে ১৮৭১ সালে W.W Hunter লিখেন "A Hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well - born musalman in bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich ."[1]

দারিদ্রে নিপতিত মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থাও ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে পড়ে। সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের স্পর্শে মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ নিয়ম নীতির সীমা ছাড়িয়ে বিদআত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার ইরানের শিয়া ধর্মের অনুপ্রবিষ্ট রীতি নিয়মের প্রভাবে ছিয়ম, চেহলাম, মাতম, শবেবরাত পালন , কবর পাকা করা, পীর মুরীদি, উরশ উদযাপন ও মাজার পুজা

[১] *W.W. Hunter;The Indian Musalmans, 15 Banglabazar, Dacca-1100, Bangladesh, First Bangladeshi Edition: June, 1975, page 141.*

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কাজ বলে স্বীকৃতি পেয়ে কুসংস্কার ক্রমান্বয়ে প্রকটতর রূপ লাভ করে ।

বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের জন্য এদেশের মানুষ সংগ্রাম , বিদ্রোহ, বিপ্লব পরিচালনা করেছে । উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ হতে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তার সুত্রপাত হয় এবং এর ভিত্তির উপর তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার পত্তন হয় ।[২]

হিন্দু আধিপত্যের চেতনাকে ধারণ করে এ আন্দোলনে সামনের কাতারে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), বোম্বের বাল গঙ্গাধর তিলক, সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাদের অন্যতম। ভারতে হিন্দু মানসিকতার এ পরিবেশেই ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।[৩]

দিল্লীর শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং তদীয় পুত্র ও শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার পূনর্জাগরণমূলক যুগপৎ আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন এ প্রক্রিয়া শুরু করে । স্যার সৈয়দ আহমদ(১৮১৭-১৮৯৮) মুসলমানদরেকে আত্বসচেতন করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন । নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) মুসলমান মানসে নবচেতনার সঞ্চার ঘটান । সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে তৎপরতা চালান । মুসলমানগন ক্রমশ ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় । এ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় । অতপর হিন্দু ও মুসলিম এ দুজাতি কখনো মিত্রতা কখনো বৈরিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে । উনিশশত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলমানগণ ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিতে সোচ্চার হয়। অবশেষে প্রায় এক দশকের ঘটনা-অঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঘাত-প্রতিঘাত ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফলতা লাভ করে।

---

[২] *Muhammad Abdur Rahim: The Muslim Society and Politics in Bengal, Published by- The University of Dacca. First Edition- November, 1978. page - 190*

[৩] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩ , পৃষ্ঠা- তের*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর জন্ম ও বংশ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে দেখানো হয়েছে তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরের অধিবাসী। এরা ছিলেন কোরাইশ বংশসম্ভূত।[৪] তিনি পিতা মাতার সান্নিধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ভারতের কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসায় কোরআন হাদিসের জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করেন ।

তৃতীয় অধ্যায়ে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর গোটা কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তাতে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, সাহিত্য সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে বিংশ শতাব্দির সূচনা থেকে অর্ধশতাব্দি পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের পূনর্জাগরণে এবং স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে যে সকল মনীষী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী তাদের অন্যতম । তিনি সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করে দেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তায় আজীবন তাদেরকে নবপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বাংলার মুসলমানদেরকে ধর্মীয় কুসংস্কার ও নানাবিধ রসম-রেওয়াজ থেকে রক্ষা করে এবং মাজহাবগত দলাদলি থেকে মুক্ত করে ইসলামের মূল আদর্শ সমাজ বাস্তবায়নই ছিল তার জীবনব্যাপিকার সাধনা।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আহলে হাদিস আন্দোলনের সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং এর প্রচার ও প্রসারে অসীম ভূমিকাও রেখে গেছেন। এ অধ্যায়ে আরো দেখানো হয়েছে মুসলমানদের জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মাওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ, ভাষা বিজ্ঞানী ডঃমোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রাজনীতিবিদ ও সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের সাথে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর ঘটনাবহুল কর্মময় জীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনা ।

পঞ্চম অধ্যায়ে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর সংগ্রাম মুখর জীবনের একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে যাতে দেখা যায় মুসলমানদরেকে দায়িত্বশীল ও সমাজ সচেতন করে তুলতে তিনি অব্যাহত সাধনা চালিয়ে গেছেন। এ পথে তিনি যশ ও খ্যাতির লালসা করেননি । তিনি তার ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমেও একটি পরিশুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ মুসলীম সমাজ গঠনে অনবদ্য চেষ্টা চালিয়েছেন ।

---

[৪] *ড.মোঃ আবদুল্লাহ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ১৮০১-১১৭১, ই.ফা.বা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ২৫৯*

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় মূল্যবান গ্রন্থরাজি, নির্ভরযোগ্য পত্রপত্রিকা ও মনীষীদের উদ্বৃতি পেশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকির সমকালীন বাংলার অবস্থা

সমাজ

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলার সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হয়। ১৭৬৫ সালে বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্বও পেয়ে যায়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদ হতে কলিকাতায় স্থানান্তর করে কোম্পানী বাংলার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ইংরেজ ঔপনেবেশিক শাসন কাঠামোতে জমির উপর জমিদারের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ হয়। অবশ্য ১৮৮৫ সালে বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে ভূমিতে প্রজার অধিকারও স্বীকৃতি পায়। ইংরেজদের চিরস্থায়ী ভূমিনীতি এবং তদসঙ্গে যুক্ত 'সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে পূর্বতন বনেদী অনেক জমিদারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমিদারী পূরাতন থেকে নতুনের হাতে স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজ শাসনাধীনে বাংলার নতুন সামাজিক রুপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে একটি নতুন অভিজাতন্ত্রের।[৫] নতুনভাবে যারা অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিল তারাই হলেন নব্য জমিদার। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ ওয়াকিল আহমদ বলেন,"তারা কোম্পানীর দেওয়ানী, বেনিয়াগিরী, মুৎসুদ্দীগিরী, দালালী, গোমস্তাগিরী, পোদ্দারী, মহাজনী করে টাকা উপার্জন করেছিলেন।"[৬]

---

[৫] *মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানঃ নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণীঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, মে ২০১৩, ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃঃ ৩৯৫*

[৬] *ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৩১*

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার উদ্ভব

ইংরেজদের নতুন শাসন ব্যবস্থায় অর্থনীতিক পরিবর্তনের হাত ধরে সামাজিক শ্রেণী পেশাতেও ব্যপক শেণী বিন্যাস সৃষ্টি হয়। ইংরেজ শাসন প্রণালীর পরিবর্তনে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সদর আলা, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়ায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুকুল্যে নগরে একটি নিম্ন-মধ্যবৃত্তির উদ্ভব হল। খুচরা ব্যবসায়ী,ছোট ছোট দোকানদার,নানা রকম ছোট খাট শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জনকারী ছোট খাট মুদ্রাযন্ত্রের চালক ও মালিক ,ধনীর অধীনস্থ কর্মচারী প্রভৃতি এর অন্তর্গত।[৭]
বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে রায়ত শ্রেণী গড়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দিল বড় ও ছোট জোতদার, ক্ষেতমজুর, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী। শহর এলাকায় তেমনি সৃষ্টি হল পুঁজিপতি,শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, ছোট বড় ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসক, আইনজীবি, শিক্ষক ও সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিভোগী শ্রেণী।[৮] ইংরেজ শাসনে অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যপক পরিবর্তনে যা ঘটেছিল তাতেই শ্রেণী পেশাগত সামাজিক স্তর বিন্যাস সুস্পষ্টভাবে দেখা দিল। তাতে ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে কতটা বিপ্লবাত্বক ছিল তা বুঝা যায়।

সামাজিক শ্রেণীভেদ

সামাজিক শ্রেণিভেদ প্রথা বহু পূর্ব থেকেই হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও এ সময় মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষার বাইরেও বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কঠোর জাতভেদের জন্ম দেয়।" সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান – এই চার শ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে উচ্চ বংশের বলে মনে করতেন। তারাই হলেন আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী।এর বাইরে যারা আছে তারা আতরাফ বা অনভিজাত এবং

[৭] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস-৩য় খন্ড,আধুনিক যুগ, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১১,পৃঃ ১৮৩*

[৮] *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, আনিসুজ্জামান, প্রতিভাস,কলিকাতা, পৃঃ ৬৭–বিনয় ঘোষ,'বাঙলার নবজাগৃতি'– কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ১৫২-১৫৩*

Dhaka University Institutional Repository

আজলাফ বা ছোটজাত শ্রেণী।[৯] এ কঠোর জাতভেদের কারণে আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ-সাদী, লেনদেন ইত্যাদিতে ব্যাপক দূরত্ব বজায় রাখা হত। মুসলমানদের মধ্যে গড়ে উঠা জাতভেদ প্রথার তীব্রতা ফুটে উঠে বিশিষ্ট গবেষক আজিজুর রহমান মল্লিকের লেখায় । তিনি লিখেছেন, " ইসলাম ধর্মের ভাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের আদর্শ হিন্দুর সংস্পর্শে এসে ভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়। ....ফলে শেখ এবং সৈয়দরা নিজেদেরকে অত্যন্ত অভিজাত মনে করে। মোগল পাঠানরা রাজপুতদের অনুসরণ করে। "[১০]

কন্যা দায়গ্রস্ততা ও যৌতুক প্রথা

কন্যা জন্মদান অনেকাংশে কলংকজনক বিবেচিত হত। অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে কন্যা সন্তানকে সম্প্রদান করতে গিয়ে পিতৃ পরিকারকে স্বর্বস্বান্ত হতে হত।

এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজমদার ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ প্রকাশিত কন্যা দায় সম্বন্ধে সোম প্রকাশ পত্রিকায় একটি নিবন্ধ তুলে ধরেছেন– " কন্যা জন্মিলেই সর্বনাশ। বরের অথবা বরের পিতা-মাতার অসঙ্গত অর্থলোভই এই বিপত্তির কারণ। অনেক স্থলে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বরের পিতা মাতা কন্যার পিতা মাতার নিকট অসঙ্গত অর্থ প্রার্থণা করেন। উচ্চ ঘরে কন্যা সম্প্রদান না করলে কুলক্ষয় হবে এই সংশয় কন্যার পিতা মাতাকে সর্বস্ব বিক্রয় করেয়াও অগত্যা সেই প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। এই কুৎসিত রীতি নিবন্ধন অযোধ্যায় কন্যা-হত্যা প্রথায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কন্যা জীবিত থাকিলে সম্প্রাদানকালে আপনাদিগকে দরিদ্র হইতে হইবে, এই ভয়ে মাতাপিতা কন্যার স্নেহ বন্ধন ছেদন করিয়া ও তাহার প্রাণ বধ করিত। উহা প্রথারূপে পরিণত হইল। বৃটিশ গভর্নমেন্টের যত্নে উহা নিবারিত হইয়াছে।"[১১]

মেয়েদের যৌতুক প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু মুসলিম সমাজে এই যৌতুক প্রথা প্রচলিত হয়। ফলে হিন্দুদের মত মুসলমানরাও কন্যা জন্ম গ্রহণ করাকে চরম অভিশাপ বলে জানত।

---

[৯] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯*

[১০] *Azizur Rahman Mallick, British policy and the Muslims in Bengal, Bangla Academy, Dacca, Second Edition, 1977, p.25*

[১১] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত,, পৃ:২১২*

Dhaka University Institutional Repository

বিধবা বিড়ম্বনা

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আরেকটি অভিশপ্ত রীতি ছিল বিধাবগণকে বিবাহ না দেওয়া। ইসলাম ধর্মে বিধাব বিবাহে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও হিন্দু প্রথা থেকে দেশাচার রূপে মুসলমান সমাজেও এটি দৃঢ় ভাবে শিকড় গেড়ে বসে। ইসলামে বরং বিধাবগণের দুর্গতি থেকে রক্ষা কল্পে তাদেরকে পুনরায় পাত্রস্থ করা অন্যতম একটি সৎকর্ম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর বৈবাহিক জীবনেই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বিধবাগণের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন; বিধবাগণের বিবাহের প্রথা না থাকায় তারা অসহায় এবং বঞ্চনার পাত্রী হয়ে সমাজের গলগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বৈধব্য জীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' (১৯৮৪) গ্রন্থে। মোহাম্মদ রেয়ামুদ্দীন আহমেদ 'মোসলেম সমাজ সংস্কার' নামক প্রবন্ধে বিধবা বিবাহ বিষয়ে লিখেছেন ,"বাংলাদেশের মধ্যে বর্ধমান বিভাগস্থ কয়েকটি জেলাতেই উপরোক্ত রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘৃণিত নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশাচার এমন একটি জিনিস যে, সহজে ইহার সুদৃঢ়.....ভান করা যায় না। এই হিন্দু প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের মধ্যে এতটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়েছে যে, অনেকে বিধবা বিবাহ দেওয়া বা বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কার্য মনে করেন। " [১২]

সামাজিক আমোদ-উৎসব

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বিভিন্ন পূজা পার্বণ আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,"দূর্গাপূজা এদেশে কখন প্রথম প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ ও মতভেদ আছে। ইহা খুব প্রাচীন না হলেও ষোড়শ শতকে ইহা যে একটি প্রধান ও লোকপ্রিয়

[১২] *কোহিনূর, আষাঢ় ১৩০৫ পৃ: ২৬–২৭ উদ্বৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪০৫*

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১৩] দূর্গা পূজা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়বহুল ও বিচিত্র রকমের আমোদ উৎসবের অনুষ্ঠান। রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়, দূর্গাপূজায় নৃত্যোৎসব, ডিনার ও সুরাপানের ব্যবস্থা থাকত। নিমন্ত্রিত ইংরেজ মেম ও সাহেবরা মদের প্রভাবে বেসামাল হয়ে হৈ-হুল্লোড় করত। গীতাদির আমোদ চলিত, রাসের মেলা উপলক্ষে পুতুল নাচ, স্ত্রী লোকের কীর্ত্তন, দলে দলে নারী পুরুষের সারি গান, বাদী পুরাণের বেশ্যার নৃত্য ইত্যাদি চলত। চৈত্র পর্ব উদযাপন উপলক্ষে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বাদনের মাধ্যমে চৈত্রের প্রথম দিবস হতে শুরু করে শেষ দুই দিবসে যাত্রা ও নৃত্যাদির মাধ্যমে তা সমাপ্ত হত।[১৪] মুসলমানদের আনন্দ উৎসবের মধ্যে বছরে দুইটি ঈদ উৎসব অন্যতম। তাছাড়া মুসলমানরা বিভিন্ন মেলা উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ করত। গাজী সাহেবের মেলা তার মধ্যে অন্যতম ছিল। মেলাতে তারা ছাগল মুরগী নিয়ে যেত এবং সেগুলো জবাই করত।অন্যান্য আনন্দ উৎসবের মধ্যে ঘোড়-দৌড়, ঘূড়ি উড়ান ইত্যাদি ছিল।

বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ

সমাজের অধোগতিমূলক আরেকটি উপসর্গ ছিল বাল্যবিবাহ। হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই এ রীতির প্রচলন দেখা যায়। সমাজে এর কুফল ছিল মারাত্মক। "মধ্যযুগে অন্ততঃ বাংলাদেশে বাল্য-বিবাহ প্রথা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হতো।[১৫] বাল্যবিবাহ রীতির প্রচলন কতটা ব্যপকতর হয়ে উঠেছিল তা রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় ফুটে উঠে," আঠার ও ঊনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমে যে সাধারণত রজ:সলা হইবার পূর্বে এবং অনেক স্থলে ইহার বহু পূর্বে, এমনকি তিন চারি বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "[১৬]

বহু বিবাহের প্রসার

[১৩] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ:১৯৬*

[১৪] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ২০৪ - ২০৫*

[১৫] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত,পৃঃনংঃ ২৪৪*

[১৬] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫*

Dhaka University Institutional Repository

বহু বিবাহের প্রভাব সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। মুসলমান শাস্ত্রে স্ত্রীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের শর্তে একের অধিক চারজন স্ত্রী একই সাথে বিবাহধীন রাখার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের অপব্যবহার করে কেবল কামপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অনেকেই চারজন পর্যন্ত স্ত্রী ঘরে রেখে তাদেরকে অসহ্য যন্ত্রণা দিত। অনেকে সতীনদের লাঞ্চনা, গঞ্জনা সইতে না পেরে আত্মবিনাশের পথ বেছে নিত। হিন্দু সমাজে কুলীন পুরূষ একাধিক বিবাহ করত। পক্ষান্তরে অনেক কুমারীর বিবাহ হতো না। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "অনেক কুলীনের ৫০, ৬০ বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত। সুতরাং ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাহার গৃহে স্থান পাইত।"[১৭] উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলাদেশে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। ইংরেজ সরকার আইনের মাধ্যমে বহু বিবাহ নিবারণ করতে না চাইলেও ধীরে ধীরে বহু বিবাহের প্রবণতা কমে এসেছে।

মুসলমানদের চেতনাহীন উদাসীন জীবন

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের দায় ভার অনেকাংশে মুসলমানদের উপর চেপেছিল। ফলে শাসক শ্রেণীর গভীর কোপানলে পড়ে এদেশের মুসলমানদের অবস্থা বড়ই সংকটাপন্ন হয়ে উঠে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিদ্রোহের ধাক্কা লাগলেও বিদ্রোহের প্রকোপ থেকে বাংলা তুলনামূলক শান্ত ছিল। তথাপিও বিদ্রোহের অভিযোগে বাঙালী মুসলমানদের অনেক নিগ্রহের স্বীকার হতে হয়। সুফিয়া আহমেদ লিখেন, "Yet the Bengali Muslims had shared the blame apportioned to their co-religionists of other parts of India and had come under the shadow of distrust and suspicion of the Government"[১৮].

তাছাড়া ইংরেজ শাসক শ্রেণী ফরায়েজী ও ওয়াহাবীদের দমনে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করে তার ফলে বাংলার মুসলমানেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাতে সংকটময় অবস্থা থেকে নয় বরং আত্মরক্ষা

[১৭] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭*

[১৮] *Sufia Ahamed, Muslim community in Bengal, Dhaka University Library, November-1974, p-165*

Dhaka University Institutional Repository

করে চলা ও সতর্ক থাকাই এদেশের মুসলমানরা নিরাপদ ভাবতে থাকে। ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলমানরা পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিমুখ থাকায় তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে।

মুসলমান সমাজের জাগরণের চিন্তা-চেতনা

মুসলমানগণ ছিলেন ভারতবর্ষের সিংহাসনের মালিক। ইংরেজদের আবির্ভাব ও উত্থানে মুসলমানগণ অবনতির অতলে তলিয়ে যায়। অশিক্ষা-কুশিক্ষা আর আদর্শহীনতায় তারা চরম অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে। যোগ্য নেতৃত্ব আর সঠিক পরিচালনার অভাবে তারা দিকভ্রান্ত ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই নিদারুণ সংকটময় অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে শেখ ফজলুল করিমের লেখনীতে " শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি, সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই মজুরি খাটিতেছি। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অশিক্ষা, ধর্মহীনতা ও আদর্শের অভাবে আমাদের এই কুফল ফলিয়েছে। আমরা অকুল সমুদ্রের মধ্যে কর্ণধারহীন জীবন-তরীর অলক্ষ্য পরিচালনা করিতেছি। আমাদের অবলম্বন কিছুই নাই। আমরা চাই প্রতিকারের ঔষধ।"[১৯]

হতাশার তিমির আর সংকটের আবর্ত থেকে মুসলমানরা জেগে উঠার দুঃসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হয়েছে। অজস্র বাধাবিপত্তির স্তূপ ঠেলে, মুসলমান সমাজকে জাগতে হয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে ইংরেজ শাষক গোষ্ঠী; তারা দণ্ড-মুণ্ডের মালিক, তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে জাতির উন্নতি-অবনতি। বিদেশী শাসকের অধীনে সুখ-দুঃখের সমভাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ কিছুটা নিজেদের চেষ্টায়, কিছুটা শাসক শ্রেণীর শুভদৃষ্টিতে সুবিধা লাভ করে উপরে উঠে এসেছেন, তারা নবচেতনায় নব-আদর্শে, নব শিক্ষায়, নব অর্থনীতিতে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলেছেন। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জীবনে ও জীবিকায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে আছে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার দ্বন্দ-কলহ, ভ্রান্তি-মোহ, জড়তা-জটিলতা, আশঙ্কা-সন্দেহ। অর্থাৎ সমাজের অবস্থা দাড়িয়েছে ত্রিশঙ্কুর মুখে।[২০]

---

[১৯] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪১২,৪১২*

[২০] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪০৮*

Dhaka University Institutional Repository

এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ না ঘটায় এবং প্রগতিশীল ও দূরদর্শী কোন নেতার আবির্ভাব না হওয়ায় মুসলমান সমাজ জাতীয় বৃহত্তর কল্যাণের পথে চলিত হতে পরেনি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল। জাতির এ দুর্যোগময় সময়ে অগ্রণী ভূমিকায় এগিয়ে আসেন বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই কর্মবীর নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী।এদের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা দেখা দেয় এবং নবজাগরণের সূচনা ঘটে।

স্ত্রী জাতির অবস্থা (সমাজ সংস্কার)

উচ্চ ঘরের হিন্দু নারীদের জীবনাচার সম্বন্ধে ১৮৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার বরাতে রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়, প্রাতঃস্নান ও পূজানুষ্ঠান ,জপ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ইত্যাদি ছিল সকাল বেলার ধনিক হিন্দু নারীদের কর্মসূচী। আহারাদি প্রস্তুত, অথিতি আপ্যায়ন ব্যবস্থা তদারকী, সকলের আহারাদিও খোঁজখবর নেওয়া তাদের দৈনিন্দন কাজ ছিল। তারা ছিল স্বামী সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।[২১] তবে সাধারণ বা নিম্নবিত্ত ঘরের অধিকাংশ নারীরা অনেক কষ্ট যাতনা তিরস্কার ও অপমান সয়ে জীবন যাপন করত।

রাজা রামমোহন রায়ের বর্ণনানুযায়ী আর সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে স্ত্রীলোক কি দুঃখ না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গীনী বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের সহিত পশুর অধম ব্যবহার করেন।"[২২]

রমেশচন্দ্র মজুদারের লেখা হতে আরও জানা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র ও অন্যান্য অনেকে স্ত্রী জাতির দূরবস্থা সম্বন্ধে অনেক

[২১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত,*পৃ. ২২১,২২২

[২২] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত,*পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন হন এবং তাদের উন্নতি সাধনে এগিয়ে আসেন। স্ত্রী জাতির দূরবস্থা দূরকরণ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুদার লিখেছেন,

"যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই ইহার সূত্রাপাত হয়, তথাপি- ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এক শ্রেণীর শাস্ত্রও বাঙ্গালী পণ্ডিতও কাল ধর্মের প্রভাবে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া বিগত একশত বৎসর স্ত্রী জাতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। "[২৩]

নারী শিক্ষা

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন খ্রিষ্টীয় মিশনারীরা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা Calcutta Female Snvenile Society নামে একটি সমিতি স্থাপিত করিয়া এ দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২৪] ১৮২১ সালে মেরী এন কুক কলকাতা এলেন মেয়েদের শিক্ষার উদ্যোগ নিতে। ১৭৬০ সালে মিসেস হেজ কলকাতায় মেয়েদের জন্য স্কুল খোলেছিলেন, তাতে ইংরেজ মেয়েরাই বেশী পড়ত। এ ধরণের স্কুল আরও কয়েকটি খোলা হয়। তবে বাঙালী মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল খোলা হয় কলকাতার গৌরবাড়িতে। স্কুলটির নাম ছিল জুভেনাইল স্কুল। সেটিতে প্রথম বছরে ছাত্রী ছিল ৮ জন এবং দ্বিতীয় বছরে ৩২জন।[২৫]রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নানা স্থানে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।[২৬]

---

[২৩] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৬*

[২৪] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৭*

[২৫] *ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন১৯৯৭, পৃ:৫৭*

[২৬] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৯*

Dhaka University Institutional Repository

পর্দার অন্তরালে থেকে মেয়েরা গৃহশিক্ষককের কাছে লেখাপড়া শিখত। বিদ্যালয়ে যাওয়া দূরের কথা, তারা বাড়ির বাহির মহলেও যেতে পারত না। সে শিক্ষা আরবী-ফারসির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজি-বাংলা শিক্ষা নারীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি।[২৭] সম্ভ্রান্ত ঘরের কিছু মহিলা সামান্য কিছু লেখা পড়ার সুযোগ পেলেও সাধারণ পরিবার গুলোতে নারী শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। মুসলমানদের লেখাপড়া বিষয়ে নবাব আব্দুল লতিফ সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রচেষ্টা চালালেও নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে তার কোন পদক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যদিকে আমীর আলী নারী শিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত দিলেও তিনি সে শিক্ষাকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি।[২৮]

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯০৩ সনে প্রকাশিত একটি পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, কলকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষার হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

মুসলমান	৩%
হিন্দু	৯%
বৌদ্ধ	১৬%
ইহুদি	৪৫%
ব্রাহ্ম	৫৩%
খ্রিস্টিয়ান	৭০%

উপমহাদেশের নারী-শিক্ষা এবং নারী-স্বাধীনতার অগ্রপথিক মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তিনি ১৯০৯ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] রোকেয়া নারীকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষা নারীর ভেতর আপন অধিকার সম্পর্কে

[২৭] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৯৫*

[২৮] *ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৯৭*

[২৯] *ওয়াকিল আহমেদ ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৫-৫৮*

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন তা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাবোধ জাগ্রত করবে।----তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিনী এবং আদর্শ মাতারুপে গঠিত করবে।[৩০]

বাংলার মুসলমানদের সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমানদের প্রাগ্রসর সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবির্ভাব ঘটে সৈয়দ আমীর আলীর। তিনি মুসলমান সমাজের আধুনিকায়নে অনন্য ভূমিকা রাখেন। ১৮৪৯ সালে হুগলিতে তার জন্ম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করে। ১৮৭৩ সনে লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে বার-এটল ডিগ্রি আইন করে ব্যরিষ্টার হন। তিনি ১৮৭৭ সনে কলকাতায় Central National Mohamedan Association প্রতিষ্ঠা করেন। "প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ৫ বছর এই সমিতি মূলত তার শক্তি ব্যয় করে সামাজিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাগত কার্যক্রমে।"[৩১]

সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের সমাজের অনগ্রসরতার প্রতিকারের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন। পাশ্চত্য জগতের নিকট ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি প্রচারে তিনি তার পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনী ও কর্ম প্রচেষ্ঠা পরিচালনা করেন।[৩২] সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের অতীত-ঐতিহ্য এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলো তার বক্তৃতা ও লেখনীতে তুলে ধরেছেন। কোন জাতির প্রতি শত্রুতা নয় বরং মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করা হবে এবং তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়া মেনে নেওয়া। এটাই ছিল তার প্রচেষ্ঠার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার অভাবে মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কার অনৈসলামিক রীতিনীতি যেমন, পীরপূজা, গোরপূজা, দরগাহ জিয়ারত সত্যপীর পূজা ইত্যাদি প্রথা সমাজে প্রবেশ করে। এসবের বিরুদ্ধে আরব দেশের মোহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-৯২) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের আদলে ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন

---

[৩০] *তৌফিকা আক্তার: **সুবহে সাদেক,** উদ্ধৃত, বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তায় মুসলিম নারী ও ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, জানুয়ারি ২০০২, ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃঃ ১২৩*

[৩১] *Sufia Ahamed, Ibid, p.178*

[৩২] *ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, পঞ্চদশ সংস্করণ-২০১০, পৃ. ৪০০*

Dhaka University Institutional Repository

এবং হাজী শরীয়ত উল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) সংস্কার মূলক ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে এসব আন্দোলন সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে নি। গবেষক ইমতিয়াজ আহমদ লিখেছেন,

"আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সত্ত্বে মুসলমান সমাজের যোগ ঘটায়নি বলে মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দেলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে নি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তা মূলত বাংলার নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবস্থাপন্ন মুসলমানরা এতে যোগ দেননি বা এর দ্বারা প্রভাবিতও হন নি।"[৩৩]

উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম বিদ্বেষ

উনিশ শতকের আশির দশকের শুরুতে হিন্দু পুনরুত্থানের ধারণা বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। এ আদর্শের গোড়াতে ছিলেন রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব (১৮৬৬-১৮৮৬), যিনি মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় সেবাতেই নিবেদিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ভাবাদর্শ বিস্তৃত করেন তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) যিনি এই ভাবাদর্শকে জাতীয়বাদের সাথে যুক্ত করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, তাঁর স্বপ্ন ছিল 'Conquest of the whole world by the Hindus race'.[৩৪] হিন্দু পুনরুত্থানের ফলে তাদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায় তাদের রাজনীতিতে ও সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। স্বামী দয়ানন্দ পরিচালিত আর্যসমাজ ধর্মীয় ও সামজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রচারিত শ্লোগান 'ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্য'। তাছাড়া বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি প্রচারিত নব্য হিন্দু-জাতীয়তাবাদ ও পুনরুত্থান আন্দোলন ছিল মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ এবং এর উৎস ছিল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। বন্দে মাতরম সহীরে জন্মই মুসলিম

---

[৩৩] *ইমতিয়াজ আহমদ,: বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর ২০০০, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃ. ৪*

[৩৪] *Lovett,V.A History of the Indian Nationalist Movement, p.65,Quoted,Sufia Ahmed, Ibid, p. 192*

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্বেষ থেকে এবং তা নিঃসন্দেহে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে তিক্ত করে। [৩৫] ১৯০২ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব পালিত হয়। এর উদ্যোক্তা সখারাম গণেশ দেউসকর এ উপলক্ষে 'শিবাজীর শিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সময় কলকাতার চরমপন্থী হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শিবাজীকে নিয়ে আত্মহারা হয়ে যায়। শিবাজী ভবানী দেবীর ভক্ত ছিলেন বলে বাংলায় ভবানী পূজার প্রবর্তন হয়। গবেষক প্রকীত কুমার গোস্বামীর মতে,

"তাই শিবাজী উৎসবে ভবানীর মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতকে বুত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শিবাজীকে জাতীয় বীররূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল।"[৩৬]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় নাট্যকার মনোমহন গোস্বামী পৃথ্বিরাজ নাটকে লেখেনঃ

"বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ

হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন "[৩৭]

এ জাতীয় রচনা থেকে সে যুগের হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 'উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের' সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। যে মারাঠা বর্গীদের হামলায় মধ্যভারত থেকে পশ্চিম বাংলার শহর ও জনপদ সমূহ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এবং অবলা নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার আর শিশুর রক্তে রঞ্জিত মারাঠা বর্গীর খঞ্জর ইতিহাসে কালিমাময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছিল বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সেই মারাঠা শক্তির জয়গানের ঢক্কানিনাদে মাতোয়ারা হয়ে উঠল।[৩৮]

---

[৩৫] *ড.মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০,৪০১*

[৩৬] *প্রভাত কুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা ১৩৮৫। উদ্ধৃত, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রন: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ:১৩২*

[৩৭] *প্রভাত কুমার গোস্বামী, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক , ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রন: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ:১৩৩*

[৩৮] *প্রাগুক্ত,*

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে হিন্দুদের চরম মুসলিম বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে হিন্দু মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের উদ্ভব ঘটায়। এই বিদ্বেষ ও তিক্ততার ধারাবাহিক পরিনতিসম্পর্কে গবেষক মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক যথাযথই লিখেন,

"এভাবে ভারতের প্রধান দুই ধর্মাবলম্ভী সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসালমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, তুরস্কের মুসলমানদের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি ও তার অন্যান্য কারণে ১৯১৬ সালে সম্পাদিত লক্ষ্ণৌ চুক্তির দ্বারা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা হলেও ১৯১১ সালে পরবর্তী ঘটনাবলী, ১৯২৪ সালে খেলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি এবং সর্বোপরি ১৯২৮ সালের 'নেহেরু' রিপোর্ট মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিত করার ফলে পুনরায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতি শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ভারতের জন্ম দেয়।"[৩৯]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালী মুসলামানের যে পুনর্জন্মের সুপ্রভাত দেখা দেয় বিংশ শতাব্দীতে এসে তা আরও সুবিস্তৃত আলোকময় হয়ে উঠে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হলে এর চেতনার ক্রমউন্নতির বাস্তবতা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট 'আজাদ' অফিসের এক ঘরোয়া বৈঠকে এর প্রতিষ্ঠা হয়। [৪০] মজিবুর রহমান খাঁ এর আহবায়ক এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, খায়রুল আনাম খাঁ, মুহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুল হাই, জহর হোসেন চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন এর সভ্য ছিলেন।[৪১] রেনেসাঁ সোসাইটির আদর্শ হিসেবে বলা হয়ঃ

---

[৩৯] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন,বাংলা একাডেমী ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ: ১৩৩*

[৪০] *বশীর আল হেলাল, আযাদ পত্রিকার ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সম্পাদকীয় উদ্বৃত্তি হতে ডঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, বাংলার মুসলিম নবজাগরণঃ ১৯০৫-১৯৪৭, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, খায়রুন প্রকাশনী, পৃঃ ৪৪৭*

[৪১] *দৈনিক আজাদ, ৩০ আগস্ট সংখ্যা, ১৯৪২; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসা আন্দোলন, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃ: ১৬২*

Dhaka University Institutional Repository

"পাকিস্তান মোসলেম ভারতে রেনেসাঁ আনিয়াছে। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে যে জাতির স্বাধীন সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছিল .... পাকিস্তান তাদের মগ্ন চেতন সত্তার মূলে তীব্র আঘাত হানিয়া তাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। মোসলেম লীগ কর্মক্ষেত্রে পাকিস্তানকে রূপদেবার চেষ্ঠা করিতেছে। কিন্তু মুসলমানদের চিন্তা ক্ষেত্রে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত না হলে কর্মক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইতে পারেনা। কাজেই বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও ছাত্রদিগকে এই দিকে সম্যক অবহিত হইতে আমরা আহবান জানাই।"[৪২]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পাকিস্তান অর্জনের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠা, আত্মচেতনাবোধের ব্যাপকতর স্ফুরনের জন্য কর্মতপরতা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার প্রথম দু'বছরেই এ লক্ষে চল্লিশটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[৪৩] সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানের একটি মানচিত্র তৈরি করে জিন্নাহর কাছে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪৪]

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি তার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তার কর্মধারা অব্যাহত রাখে। প্রতিষ্ঠিাতা কর্ণধারগণের স্বপ্নের 'পাকিস্তান' এর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা

লাভের বিশেষত কলিকাতা কেন্দ্রীক মুসলিম সাহিত্যিক বৃন্দ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।[৪৫]

রাজনীতি

বৃটিশ শাসনাধীনে হিন্দুরা গোড়া থেকেই নিজেদের ভাগ্য বদলের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ব করতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। হিন্দু সমাজে রাজা রাম মোহন রায়ের আস্তিক্যবাদী, মূর্তীপূজা ও বর্ণবিরোধী এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদমূলক আন্দোলন ক্রমশ হিন্দুদেরকে রাজনীতি সচেতন করে তুলে। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান

[৪২] *সম্পাদকীয়, আজাদ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২; বশীর আল হেলাল, পূর্বোক্ত পৃ: ৮৩-৮৪)*

[৪৩] *সাঈদ-উর- রহমান, পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫*

[৪৪] *মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাঃ আবুল কালাম শামসুদ্দিন রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭১-৩৭২*

[৪৫] *ডঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, বাংলার মুসলিম নবজাগরণ (১৯০৫-১৯৪৭), খাইরুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ:৪৫৭*

Dhaka University Institutional Repository

এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় সফল হন, যার লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মতে প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা। বিদেশী বণিক সরকারের দালালি করে অগাধ অর্থ উপার্জন করে একটি নতুন ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে উঠে। অপরদিকে হতভাগা জনসাধারণ কোম্পানীর নিবর্তন মূল রাজস্বনীতিতে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। অবর্ণণীয় দুর্গতির শিকার হয়ে বাংলার জনগণ নানা সময়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

তাঁতি বিদ্রোহ (১৭৭০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৭৮৯), লবণ বিদ্রোহ (১৭৮০), চোয়ার বিদ্রোহ (১৭৮৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১-৭০), ফরায়েজী আন্দোলন (১৮৩৮), বিবিধ কৃষক ও প্রজা বিদ্রোহ বাংলায় সংঘটিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহের মূলত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জনসাধারণের জীবন সংগ্রামকে টিকে থাকার আকুলতা থেকে উদ্ভুত। তবে এর কতক ছিল সনাতন চিন্তা চেতনা ও ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে উৎসারিত।

"আধুনিক রাজনীতির আদর্শ জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তার আদর্শে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাধ রাজনীতির সূচনা হয়। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যার আত্মপ্রকাশ ঘটে। শহরের নব্য শিক্ষিত শ্রেণী এ ধরনের রাজনীতির নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বের বিদ্রোহ ও আন্দোলন গুলিতে নবগঠিত মধ্য শ্রেণী যোগদান করেন নি। এমনকি সেগুলি সমর্থনও করেনি।"[৪৬]

১৮৭৬ সাল নাগাদ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক ধরনের জাগরণ সূচিত হয়। তারা পশ্চিমা ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর চিন্তা করেছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন চেতনা দেখা যায় নি। যার কারণ ছিল পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণে ধীরগতি। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) আগে পর্যন্ত তাদের কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দেখা যায়নি।[৪৭]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

[৪৬] *ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, পৃঃ ৫১৯*

[৪৭] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 164*

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহী বিদ্রোহ ছিল মূলত কোম্পানীর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সিপাহীদের বিদ্রোহ। এটি সিপাহীদের বিদ্রোহ মনে করা হলেও এতে বেসামরিক লোকদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। স্যার জেমস আউট রাম মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের মূলে ছিল মুসলমানগণ এবং তাহারা হিন্দু গণকে দলে টানিয়া লন।[৪৮]

বহুবিধ কারণে মুসলমানগণ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোম্পানী শাসকদের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোপ বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণে এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাযয়াফতি প্রভৃতির ফলে মুসলমানদের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট হয় এবং তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।[৪৯]

লর্ড ডালহৌসির প্রস্তাবে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোঘল সম্রাটের উপাধিরহিত করণ এবং উত্তরাধিকারীদের রাজপ্রাসাদ ছাড়া অমর্যাদার ছিল বলে মুসলমানরা এই প্রস্তাবে রুষ্ট হয়।

এরপর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান রাজ্য অযোধ্যা সরকারের শাসনাধীনে আনায় মুসলমানদের অসন্তষ বৃদ্ধি পায়। এজন্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ অযোধ্যায় গণ-বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। স্বত্বলোপ-নীতির মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে বৃটিশ সরকার অনেক দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করে। সাতারা, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করায় এদের হিন্দু শাষক, কর্মচারী, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।[৫০]

বিদ্রোহের ঘটনাবলী

১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাটের একদল সিপাহীর ইনদিলড কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। অতঃপর ১০ই মে মীরাট সৈন্যাবাসে তিনটি রেজিমেন্ট সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর

---

[৪৮] *এম.এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মে ২০০৫, পৃ:৮৭*

[49] *WWHunter, Indian Muslmans: 153-57*

[৫০] *এম.এ.রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ:৮৯*

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমনে সম্রাট পালিয়ে যান এবং ধৃত হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।অযোধ্যা, কানপুর, রোহিলা খন্ড এসব স্থানের বিদ্রোহ বৃটিশ সৈন্যবাহিনী কতৃক দমিত হয়।

বাংলায় বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের ২৬ শে জানুয়ারি কলিকাতার ছোট লাটের বাসভবন, টাকশাল ও ধনাগার সিপাহীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি এবং পাটনার জমিদার মানসিংহ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ২৯ শে মার্চ বারাকপুরের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হলে তা দমন করা হয়, ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪ নং রেজিমেন্টের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করে এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করে। তারা ঢাকার পথে রওনা হয়ে ফেনী নদী পার হতে না পেরে শ্রীহট্টে পৌছে। মেজর আর.বি.রায় সিপাহীদের সাথে লড়ে মৃত্যু বরণ করলেও ১৮৫৮ সালের ২২ জানু শ্রীহট্টের বৃটিশ সৈন্যদল সিপাহীদের আক্রমণ করে পর্যদুস্ত করে। ঢাকার ২৩ নং রেজিমেন্টের সিপাহীদেরকে নিরস্ত্র করা হয়। ২২ নভেম্বর লেফটেন্যান্ট লুই এর নেতৃত্বে লালবাগ সিপাহীদেরকে বন্দুকযুদ্ধে পরাস্ত করা হয়। তাদের চল্লিশ জন মারা যায় ও ধৃতদের ফাঁসি দেয়া হয়। জেলখানার ছয়শত জন কয়েদী পাহারাদারদের পরাস্ত করে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তবে জামালপুরে ইংরেজগণ পাহারাদার সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে তাদেরকে পরাস্ত করে। বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়, কলকাতায় সৈন্য জড় করে লর্ড ক্যানিং বৃটিশ বাহিনী পাঠিয়ে দেন দিল্লী মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। চূড়ান্তভাবে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি পুনরাধিকার করা হয়। বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দী করে নির্বাসন দেওয়া হয়।[৫১]

বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাসক ও শাসিত উভয়ের মাঝে বিদ্যমান ছিল। সরকার সাবধানী এবং সন্দেহ পরায়ণ হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ সরকার তখন ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি গভীর সন্ধিগ্ধ হয়ে পড়েছিল।[৫২] বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রফেসর লতিফা আকন্দ লিখেছেন,"The effects of the Mutiny lasted for a long time on both

[৫১] *শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পৃ:২১৮*

[৫২] *Sufia Ahmed, Ibid, p.65 .*

Dhaka University Institutional Repository

rules and rule. The Government became cautious and suspicious, while the English continued to regard the Indians, in particular the Muslims withe grave ruspision, the Muslim on their part considered everything British as something to be shunned".[53]

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পরিক্রমায় বিভিন্ন দিক থেকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিদ্রোহের অব্যবহিত ফলাফল ছিল, বৃটিশ বাণিজ্য কোম্পানীর শাসনকালের অবসান লাভ। ভারতে শান্তি পুরোপুরি ফিরে আসার আগেই বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের জন্য ভাল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২ তারিখ একটি আইন পাশ করে যার নাম ছিল 'এ্যাক্ট ফর দি বেটার গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া'। সেই আইন অনুযায়ী রানী ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষনা করা হয়।[৫৪]

সিপাহী বিদ্রোহ ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় নতুনভাবের উদয় হয়। তারা পশ্চাৎপদ চিন্তা থেকে উঠে এসে নিজেদের এগিয়ে চলার পথকে সুগম করাতে প্রয়াসী হয়ে উঠে। দীর্ঘদিন নিশ্চল জীবন চলার পর তারা সম্বিত ফিরে পায়। তাদের নির্জীব অবস্থা থেকে আত্মোপলব্ধি ঘটাতে যিনি মহান নেতার ভূমিকায় কাজ করেছেন তিনি হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮)। তিনি এই সময় হতে শাসক শ্রেণী এবং তার অধঃপতিত সম্প্রদায়ের মাঝে মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হতে শুরু করলেন। [৫৫] তিনি বুঝে নিলেন দীর্ঘকাল ব্যাপী পিছনে পড়ে থাকা স্বধর্মীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিতে শাসক ইংরেজ সাথে একটা বোঝাপড়ার কোন বিকল্প নেই।এমনকি ইংরেজ মন থেকে সন্দেহের কালো দাগ মুছে দেওয়ার জন্য তিনি একটি বইও লিখলেন 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ' (ভারতে বিদ্রোহের কারণসমূহ) নামে এই বইতে তিনি মুসলমানদের উপর আরোপিত বিদ্রোহের যাবতীয় দায় দায়িত্ব স্খলনের চেষ্টা করেছেন। একই সাথে তিনি বিদ্রোহ সংগঠনে ইংরেজদের দায়িত্বহীন ও তাদের শাসন ব্যবস্থা ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

---

[53] *Latifa Akanda: Social History of Muslim Bengal, Published by-Islamic Foundation Bangladesh , First Edition- May 1981. p:28*

[৫৪] *শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ:২১৮, ২১৯*

[৫৫] *Latifa Akanda, Ibid, p.28*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি Loyal Mohammedans of India বইটি প্রকাশ করে মুসলমানদের রাজভক্তির উদাহরণ তুলে ধরেন এবং কতিপয় রাজভক্ত মুসলমানের পরিসংখ্যানও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহের সময় মুসলমানরাই সব চাইতে রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্ত পত্র পত্রিকায় যেভাবে গোটা মুসলমান জাতটাকেই এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে সেটা খুবই সূচনীয়। [৫৬]

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ক্রোধ প্রমশিত করার পর স্যার সৈয়দ আহমেদ এবার স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রীয় সহযোগীতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকার লাভ করা। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি Translation Society প্রতিষ্ঠা করেন। [৫৭] সৈয়দ আহমদ খান স্বধর্মীয় মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন, তাদেরকে আত্মসচেতন করে তুলতে ১৫৫৮ সালে আধুনিক ইতিহাস পাঠের জন্য মোরাদাবাদে তিনি একটি বিদ্যালয় খোলেন। ১৮৬০ সালে আলীগড়ের বৈজ্ঞানিক সমিতি নামে একটি অনুবাদ সমিতি গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। ১৮৬৬ সালের ১০ মে আলীগড়ের বৈজ্ঞানিক সমিতির ইনস্টিটিউটে তার প্রস্তাবে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন আলীগড়' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়।

'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' সম্ভবত প্রথম হিন্দু-মুসলিম যুক্ত সংগঠন, যেটা ভারতীয় সমস্যাগুলো এবং জনসাধারনের সাথে তাদের শাসকদের সম্পর্ককে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।[৫৮]

(১৮৬৯-৭০) সালে সৈয়দ আহমদ ইংল্যান্ড যাত্রাকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং প্রশাসনিক কাঠামো এবং পাঠ্যসূচী গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন। এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি ভারতে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। [৫৯]

---

[৫৬] *Syed Ahmed khan, The causes of Indian Revolt উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮), প্রতিভাস কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯ পৃ:৭০*

[৫৭] *Syed Ahmed khan, The causes of Indian Revolt উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ:৭০*

[৫৮] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ:৫৮*

[৫৯] *উদ্ধৃত, ইনাম-উল-হক, পৃ:৬০*

Dhaka University Institutional Repository

সতের মাস ইউরোপ পরিভ্রমণ করে এসে তিনি ১৮৭০ সালে 'তাহযীব আল আখলাক' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে মুসলমানদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার উন্নতির প্রচেষ্টা চালান।

১৮৭০ সালে তিনি 'Society for the Educational progress of Indian Muslims' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতি মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৬০]

মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ বা এক কথায় আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আলীগড় মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মুসলমান ছাত্ররা শুধু আধুনিক কলা বিজ্ঞানই শিক্ষা গ্রহণ করে না বরং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় একাত্মতার দরুন আলীগড় তাদের ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনায়ও সহয়তা করে।[৬১]

আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আবর্তিত হয়। একে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা, চিন্তা ভাবনা উদ্ভাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে সচেতন মুসলমান হিসেবে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের যে আন্দোলন সূচনা হয় একেই বলা হয় আলীগড়আন্দোলন এবং এখানেই স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের সফলতা।[৬২]

১৮৮৬ সালে তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে সমিতি গঠন করে আলীগড় আন্দোলনের বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। আর পেছনে লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে তুলে এনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত ও জাতীয় নেতায় পরিণত হলেও তিনি ছিলেন মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। Hafeez Malik যথাথর্ই বলেছেন,'In the darvest hour of the muslim national life a great personality arose. At the critical

[৬০] *উদ্ধৃত, ইনাম-উল-হক, পৃ:৬৪*

[৬১] *উদ্ধৃত, ইনাম-উল-হক, পৃ:৬৫*

[৬২] *উদ্ধৃত, ইনাম-উল-হক, পৃ:৬৬*

Dhaka University Institutional Repository

moment Sir Saiyed Ahmad Khan came to the fvont of the battle and led the struggle for the national emancipation of the Moslems.'[৬৩]

তার কর্মময় জীবন ও প্রজ্ঞপূর্ণ কর্মকুশল সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

"The half century after 1857 was dominated by the towering personality of Sir Saiyad Ahmad khan and by his disciples. Their policy was based on unquestioned loyalty to the British government, simply because they had no alternative."[৬৪]

মুসলমানদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি হলো যে, ইংরেজী না শেখার ফলে তারা বড় ধরনের ভুল করেছে। তাদের এ পেছনে পড়া থেকে এবং গতিহীন নিশ্চল জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে ইংরেজী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এই চেতনাবোধ যাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল বাংলায় তাদের অগ্রপথিক ছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ। 'তিনি অনুভব করেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসন এত শক্তিশালী যে, তা প্রতিহত যোগ্য নয় এবং এতটা উপকারী যে, তাকে অবজ্ঞাও করা যায় না। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, বৃটিশ শাসনাধীনে যারা উন্নতি করতে চায় তাদেরকে এ শাসনের পক্ষভুক্ত হবে। স্বীয় ধর্মভুক্তদের সামনে বৃটিশ সংস্কৃতি, বৃটিশ অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক শাসন প্রণালীর সঙ্গে দলভুক্ত হলে কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তা তাদের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেন।[৬৫]

মুসলমান সমাজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়াস ঘটানো এবং ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন এই দুই আদর্শ সামনে রেখে তিনি এক ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচী হাতে নেন। এই কর্মসূচীর আওতায় ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' নামে একটি

---

[৬৩] *Hafeez Malik, Moslem Nationalism In India and Pakistan, Published by- Public Affairs Press, Washington, D.C, First Edition: 1963. p:208*

[৬৪] *Ibid p:208*

[৬৫] *Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal 1884-1912, Published by- Oxford University Press Bangladesh, First Edition: November , 1974.p.no:166,167*

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। লিটারেরী সোসাইটি টি মোটেও কোন রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। এর বিঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত: সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক।[৬৬]

সংগঠনটির কার্যধারা ছিল দ্বিমুখী: আলোচনা ও রচনা পাঠের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান এবং নিজেদের চিন্তা ধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধন, আর উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সরকারকে নানা রকম পরামর্শ দান।[৬৭]

সৈয়দ আমীর আলী

উনিশ শতকে দ্বিতীয় ভাগে যখন মুসলমানদের চরম দুর্দিন চলছিল, এমনি সময়ে আবির্ভাব ঘটে সৈয়দ আমীর আলীর। সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম হয়েছিল ১৮৪৯ সালে প্রাক্তন ডাচ বসতি ছুড়ায় (কর্টক)। পিতা ছিলেন শিক্ষানুরাগী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ত্ব সাদত আলী।আমীর আলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও বি. এল.ডিগ্রী লাভ করে ১৮৭৩ সনে লন্ডনের 'লিঙ্কস ইন' থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগদান করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে ১৮৯০ সালে বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭৮-৮৩ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন, ১৮৮৩ সালে ভাইসরয়ের উপদেষ্টা এবং ১৯০৯ সনে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে সদস্য হিসেবে নিয়োজিত হন।

আমীর আলী কেবল শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞই ছিলেন না, একাধারে তিনি দূরদর্শি চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদএবং প্রাগ্রসর সমাজ সংস্কারক ছিলেন। মুসলমানদের আধুনিকীকরনে তাঁর স্বপ্ন ছিল।[৬৮] ইতঃপূর্বে মুসলমানদের দুজন অগ্রনায়ক স্যার সৈয়দ আহমদ ও নবাব আবদুল লতিফ স্বজাতির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালালেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে তারা বিমুখ ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলী এই অবস্থান থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নির্মাণের কথা ভেবেছেন। তিনি ১৮৭৭ সনে কলকাতায় Central Nationnal Mohamedan

---

[৬৬] *Rafiquddin Ahmed, The Bengal Muslims (1871-1906) A Quest for Identity, Published by- Delhi Oxford University Press, First Edition: 1981p:163*

[৬৭] *উদ্ধৃত, ইনাম-উল-হক, পৃ:৮৭*

[৬৮] *ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহীম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯*

Dhaka University Institutional Repository

Association গঠন করেন। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন ও ঐক্য স্থাপন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ন্যায় সঙ্গত দাবি দাওয়া পেশ করা ছিল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৬৯] সৈয়দ আমীর আলী যথার্থাই ভারতের আবহাওয়াকে নিরীক্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং স্বজাতি মুসলমাদের জন্য যা কিছু উপযোগী তা নিগূঢ়ভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেন,

I do not need to dwell on the fact that India is not a homogeneous country. It is avast continent composed of numbers of communities' differering from each other in ideas, traditions, religion and language, what is suited fror one is not sited for the other."[৭০]

আমীর আলীর সমিতি মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় কাজ করলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। এর কারণ সৈয়দ আমীর আলী বুঝতে পেরেছিলেন, "The welfare of the Mohamedan is intimately connected with the well-being of the other races of india."[৭১]

মুসলমানদের অনগ্রসতার কারণ এবং এর প্রতিকার কী হতে পারে সে সম্পর্কে আমীর আলী তৎকালীন পত্র পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেন।

আমীর আলী ইসলামের গৌরবগাঁথা চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে বানী সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তি, সাম্য ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিল তাহা এখন নূতন তেজের সহিত শুনিবার সময় আসিয়াছে, এই তেজ চৌদ্দ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক জীবন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে"।[৭২]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ও পরে বেশ কিছু রাজনৈতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ ছিলেন প্রায় সবক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। এর পর ১৮৫১ সালে বাংলায়

---

[৬৯] *ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহীম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯-৪০০*

[৭০] *K.K. Aziz: Ameer Ali His Life and Work , Publishers United Ltd, 176, Anarkali , Lahore 1968 p-513*

[৭১] *Sufia Ahmed, Ibid, p.no:164*

[৭২] *স্পিরিট অব ইসলাম (৫ম সংস্করণ) ভূমিকা ১ হতে উদ্বৃত, এম.এ.রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩*

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। ডঃ রিজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামগোপাল ঘোষের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ কয়েক যুগ ধরে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসেবা করে যান। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল এ সংগঠন চিল একটি অতি সচল প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৬ সালে অলীগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন আলীগড়'।[৭৩]

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) বাংলাদেশের মুসলমানদের উন্নতির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে তাদের অগ্রযত্রার পথে নিয়ে গেছেন। ১৮৬৩ সালে তিনি 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটান। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার তিনি বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে সফল হয়েছেন। এদিকে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে আরেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।এসব সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করা। এ সময় দেশব্যাপি যে প্রবল রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয় তার পেছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর। ১৮৪৮ সনে কলকাতায় তার জন্ম চিকিৎসক পিতা দুর্গাচরণের উৎসাহে তিনি ১৮৬৮ সনে বি.এ ও ১৮৬৯ সনেসিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ সনে তিনি সিলেটের মৌলবীবাজারে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়ে সামান্য কারণে বরখাস্ত হন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী দেশব্যাপি জনমত গঠনের মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ এক মহা আন্দোলন গড়ে তুলেন।ইংরেজ সরকার সোচ্চার আন্দোলন দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

দাবি আদায়ের জন্য ভারতীয়দের বিক্ষিপ্ত আন্দোলনগুলোকে শাসনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার জন্য এবং আন্দোলনে বাধাপ্রদানের জন্য সরকার উঠে পড়ে লাগে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয়

[৭৩] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২*

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায় ১৮৮৫ সালের ২৮ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। গবেষক খুরশীদ আলম সাগর বলেন,

"তিনি এমন একটা দল গড়লেন যার লক্ষ্য হলো এদেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত সমাজের প্রতিবাদ শোভন খাতে বহমান রাখা, যাতে ভবিষ্যতে ইংরেজ সরকারের সংগে কথাবার্তার মাধ্যমে বোঝাপড়া করা যায়। আসলে কংগ্রেস নামে দলটা যেন আন্দোলনকারী ভূমিকা না য়ে সেটা দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিউমের।"[৭৪]

বাঙালী ব্যারিস্টার মি. উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সের দল নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৭৫]

"মুসলমানরা কংগ্রেসের কার্যাবলী সমর্থন করেছেন বা কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে "।[৭৬]

এছাড়া ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে মুসলমানদের উপর যে দুর্দশা ও নির্যাতন অতিবাহিত হয়েছে তাতে হিন্দুরা অব্যাহতভাবে ইন্ধনই যুগিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের ইংজে বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্রকে হিন্দু জাতীয়তবাদের সমতুল্য ভেবে মুসলমানরা এটাকে প্রত্যাখ্যান করে।[৭৭]

হিন্দু ধর্মীয় উগ্র জাতীয়তাবাদ

[৭৪] *খুরশীদ আলম সাগর, পলাশী প্রান্তর থেকে বাংলাদেশ (১৭৫৭-১৯৭১) ও আমাদের স্বাধীনতা, শোভা প্রকাশ, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, একুশ বইমেলা, ২০০৪, পৃ:৬৭*

[৭৫] *ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯২*

[৭৬] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫*

[৭৭] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩*

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তার সূত্রপাত হয় এবং এর ভিত্তির উপর তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার পত্তন হয়।[৭৮] উনিশ শতকের আশির দশকের শুরুতে হিন্দু পুনরুত্থানের ধারণা বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। এ-আদর্শের গোঁড়াতে ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬), যিনি মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় সেবাতেই নিবেদিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ভাবাদর্শ বিস্তৃত করেন তঁর শিষ্য বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২), যিনি এই ভাবাদর্শকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, তাঁর স্বপ্ন ছিল 'conquest of the whole world by the Hindu race'.

তিলকের মূল বক্তব্য ছিল - হিন্দুস্থানে মুসলমানদের কোন স্থান নেই । তিনি কথাটি এভাবে বলেছেন, "God has conferred on the Meleccha (Muslems) no grant of Hindustan inscribed on impreshable brass".[79]

হিন্দু জাতীয়তার মূল বিষয় ছিল হিন্দুদের প্রাচীন গৌরবগাথার জয়গান এবং মুসলিমদের হীন বীর্যতার চিত্রায়ন। মুসলিম বিদ্বেষজাত হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রচরনার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন বোম্বইয়ের বাল গঙ্গাধর তিলক।

সুফিয়া আহমদ উল্লেখ করেছেন-"ভারতীয় মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারে, তিলকের এ-ধরনের দ্বিতীয় কাজ ছিল শিবাজি-উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া। এটি ছিল মারাঠ নেতা শিবাজির জন্ম ও অভিষেকের উদ্‌যাপন। ১৮৯৫ সালে রায়গড় দুর্গে এটি প্রথম উদ্‌যাপিত হয়। মারাঠা যোদ্ধা শিবাজি ছিলেন মোগলদের ঘোরতর শত্রু এবং মুসলমানরা মনে করত যে, তিনি মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবাজি-ফুজার প্রচলন নিশ্চিতভাবেই মুসলমানদের অনুভূতিকে হিন্দু বিরোধী করেছিল। উপরন্তু, বিজাপুরের সুলতানের প্রেরিত আফজল খানকে শিবাজি কর্তৃক হত্যার ঘটনাটি তিলক যুক্তিসঙ্গত বলে বর্ণনা করলে মুসলমান-অনুভূতিতে আঘাত লাগে।

রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব '(১৩১১) কবিতা রচনা করে শিবাজীর মহত্ত্ব তুলে ধরেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপ্নের কথা প্রচার করেন। বিপিনচন্দ্র পাল এটি সমর্থন করেন এই বলে যে,

---

[৭৮] *Muhammad Abdur Rahim , The Muslim Society and Politics in Bengal, Published by- The University of Dacca . First Edition- November, 1978. p. 190*

[৭৯] *Hafeez Malik, Ibid, P:224*

Dhaka University Institutional Repository

'শিবজী হিন্দুর সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক', তাঁকে সমর্থন করার অর্থ হিন্দুর আদর্শকে সম্মান করা।[৮০]

১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত কলঙ্ক', ভারতবর্ষ পরাধীন কেন-এই প্রবন্ধে হিন্দুদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গণ্য করেছেন। বঙ্কিম সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও মুসলিম বিদ্বেষ প্রবণতা ছিল তার সাহিত্যের মূল উপাদান। তিনি মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুখ দিয়া ধর্মীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রচার করাইয়াছেন। তাঁহার আনন্দমঠ উপন্যাসে তিনি সন্ন্যাসীদের নায়ক ভবানন্দের উক্তি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "সকল দেশের রাজাদের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের (নেড়েদের) না তাড়াইলে আর কি হিন্দুদের হিন্দুয়ানী থাকে?"[৮১]

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ব মুসলিমাবাদ

মুসলমানদের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক চিন্তা বিশ্বাস ও কৃষ্টির অনুপ্রবেশ করেছিল। যার কারণে মুসলমানদের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল। হাজী শরিয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, মাওলানা কেরামত আলী প্রমুখগণ স্বজাতির ভেতরে সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় একটিই ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ধর্মের প্রচার ও ধর্মসংস্কারের মধ্যেই ছিল মুসলমানদের পুনর্জগরণ,এই বিশ্বাস তাঁরা পোষণ করতেন।ওয়াকিল আহমদ বলেন, এটি মূলত আমীর আলীর দান। তার আদর্শ ও চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে অচিরেই কয়েকজন লেখক,সাংবাদিক ও সমাজকর্মী আত্মপ্রকাশ করেন যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে 'বাংলী মুসলিম জাতীয়তাবাদের' জন্ম দেন।

এদের মধ্যে আছেন মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ,রেয়াজুদ্দিন আহমদ মাশহাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম,

---

[৮০] *ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ: ৫৩২*

[৮১] *এম.এ.রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৭-১৪*

Dhaka University Institutional Repository

কায়কোবাদ,ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী, নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুল করিম বিএ, তসলিমদ্দীন আহমদ বিএ, শেখ ওসমান আলী বিএ প্রমুখ।

নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা পাঠ্য পুস্তকে ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। নবাব অবদুল লতিফ পাঠ্য পুস্তকে অনৈসলামিক বিষয় উঠিয়ে দেয়ার কথা বলেন। অন্যান্য কবি সাহিত্যকরা অনুবাদ গবেষনা ও মৌলিক গ্রন্থ লিখে ইসলামের ঐতিহ্য তুলে ধরেন। ওয়াকিল আহমদ আরও লিখেন,

"মাতৃভাষাকে আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করায় ক্রমে বাঙালি মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়বোধে'র উন্মেষ হয়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর আন্দোলনে বাঙালি হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের ধারণাটি স্পষ্ট ছিলনা; তাঁরা নিজেরাই উর্দু-ফারসির সমর্থক ছিলেন। উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান আত্ম-পরিচয়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর দেয়।"[৮২]

সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী (১৮৩৮-৯৭)ইসলামের ভ্রাতৃত্ব নীতি অবলম্বন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে একত্র করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য কিংবা বৃটিশসাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরূদ্ধে রুখে দাড়ানোর নীতি প্রচার করেন। এই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রও তিনি ভ্রমণ করেন।

ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, "খলিফাতুল মুসলেমিনের আদর্শ ধর্মীয়, প্যান-ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি রাজনৈতিক। স্বয়ং আমীর আলী এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। বাংলার অনেক লেখকও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ মাশাহাদী জামালউদ্দিন আফগানীর সাক্ষাত ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) গ্রন্থখানি প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়।[৮৩]

১৮৭৭ সালে রাশিয়া তুরস্কের উপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। ১৮৭৮ সালের ৩ মার্চ রুশ তুর্কী 'সান স্টেফানে' চুক্তির মাধ্যমে অধিকাংশ রাজ্যে তুরস্কের ক্ষমতা লোপ পায়। মুসলিম খিলাফতের ঐতিহ্যধারী তুরস্কের দুরবস্থায় ভারতের মুসলমানরা মর্মাহত হয়। আবদুল লতিফ তাঁর আত্মজীবনীতে (মাই পাবলিক লাইফ) লিখেছেন যে, তুর্কী সার্ভিয়ার যুদ্ধে বাংলার

[৮২] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭-৫২৮*

[৮৩] *ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৯*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সহানুভূতি সুলতান ও তুরস্কের জনগণের প্রতি পুরামাত্রায় ছিল।[৮৪] ঐ যুদ্ধের সময় মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে বিশেষ মুনাজাত করে। এসবই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনার ফল। বাঙালি মুসলমানের 'আত্মপরিচয়' (Identity) ও 'মুসলিম জাতীয়তা'র (Muslim Nationalism) গঠনে এসবের প্রভাব পড়েছে।[৮৫]

বঙ্গভঙ্গ ও হিন্দু-মুসলিম প্রতিক্রিয়া

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।এটি ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনকালের (১৮৯৮–১৯০৫) সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। গোটা বাংলা, বিহার,উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি বা বঙ্গদেশ। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসি বলেন, একজন লোকের পক্ষে এত বিশাল একটি প্রদেশ শাসন করা কঠিন কাজ।[৮৬]

১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সুপারিশ ছিল বাংলাদেশকে বিভক্ত করা। অবশ্য ১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা সুপারিশ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে বাংলা প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় এক লক্ষ ঊননব্বই হাজার বর্গ মাইল আর লোক সংখ্যা দাঁড়ায় সাতকোটি আশি লক্ষ।[৮৭]

লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলা সফরে বের হয়ে জনগণের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ লক্ষ্য করেন। লর্ড কার্জন বিভিন্নসভায় ঢাকাকে রাজধানী ধরে পূর্ব বঙ্গের উন্নয়নের আশ্বাস দেন। বস্তুত বৃটিশ শাসনের গোড়া থেকে এই অঞ্চলটি অবহেলিত। মিল, কলকারখানা সব কলকাতার হুগলী নদীর তীরে। ফলে বেকারত্ব পূর্ব বাংলায় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এছাড়া বিস্তৃর্ণ চর ও হাওড় অঞ্চল থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় চুরি, ডাকাতি ও নিরাপত্তাহীনতা ছিল সর্বত্র। এমতাবস্থায় নতুন প্রদেশ গঠন অবশ্যম্ভাবী ছিল। এছাড়া কার্জনের রাজনৈতিক অভিলাষও

---

[৮৪] *ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০*

[৮৫] *ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩১*

[৮৬] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫*

[৮৭] *ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫*

Dhaka University Institutional Repository

এতে ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী অন্দোলনের জন্মদাতা বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিদের প্রভাব কংগ্রেস থেকে হ্রাস করতে কার্জনের এই বিভক্তির পরিকল্পনা।

১৬ মে ১৯০৫ বঙ্গবিভাগ ভারত সচিবের অনুমোদন লাভ করে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ, তৎসহ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগসমূহ। দার্জিলিং বাদ দিয়ে ত্রিপুরা (আধুনিক কুমিল্লা) ও মালদহ জেলার অন্তর্ভূক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী ও চট্টগ্রামকে দ্বিতীয় সদর দফতর করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এই প্রদেশ গঠিত হয়। লোকসংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু[৮৮]

পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, বিশেষত মুসলমানরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশের কথা চিন্তা করে এ বিভক্তিকে অভিনন্দন জানান।[৮৯]

'মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকা যা ইতঃপূর্বে ১৯০৬ সালের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল, তারাও এখন এর অন্তর্নিহিত সুবিধাদির কথা বুঝতে পেরে একে স্বাগত জানায়।[৯০]

পূর্ববঙ্গের বিশাল জনগোষ্ঠি বঙ্গ বিভাগকে অভিনন্দন জানায়। দীর্ঘ সময়ের অবহেলার শিকার এ নতুন প্রদেশটির প্রতি সরকারের বিশেষ নজর পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এর প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হবে ভেবে তারা আনন্দিত হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ একে স্বাগত জানান। কলকাতার মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সরকারকে অভিনন্দন জানায়। তবে নবাব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই নবাব আতিকুল্লাহসহ কোন কোন মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন।[৯১]

বঙ্গবিভাগ হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। নতুন প্রদেশের সম্ভাব্য সীমারেখা প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই দেশময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তা অপ্রত্যাশিত ছিলনা। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। বণিক সমিতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলি একযোগে এর তীব্র নিন্দা করল।সমগ্র দেশ সভা সমিতির মাধ্যমে বঙ্গ বিভগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের শপথ নিল। জাতীয় কংগ্রেস এর বাৎসরিক সভায় এই বঙ্গ বিভাগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করল এবং ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করল।

---

[৮৮] *ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১১৬

[৮৯] *পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদের কার্যবিবরনী,এপ্রিল,* ১৯০৯, *ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত,* ১১৮

[৯০] *The Muslim Chronicle,* ৯ *সেপ্টেম্বর,* ১৯০৫, *উদ্বৃত ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১১৯

[৯১] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ.* ১২০

Dhaka University Institutional Repository

যেদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারীভাবে ঘোষিত হয়, সেদিনকংগ্রেস দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। বাঙালির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখী বন্ধন' অর্থাৎ বাহুতে লাল ফিতা ধারণ করে, ১৬ অক্টোবর উপবাস করে, সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সকালে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল উক্ত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য।[৯২] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কলকাতার তুঙ্গে উঠে। কলকাতার উকিল সম্প্রদায় ভেবে দেখলেন, নতুন প্রদেশের জনাকীর্ণ জেলাগুলোর জন্য গঠিত নতুন হাইকোর্ট তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতার পত্র-পত্রিকার মালিকগণ চিন্তা করলেন,নতুন প্রশাসনের রাজধানী ঢাকা থেকে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাদের কার্যাবলী ও প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাবে। বাংলার হিন্দু সমাজ প্রচার করতে থাকেন যে, বঙ্গভঙ্গ অর্থ হচ্ছে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং ফলে দেবী কালীর প্রতি অপমান। হিন্দু ধর্মে কালী মাতৃভূমির প্রতীক। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা 'বন্দে মাতরম' কে তাদের জাতীয় শ্লোগান ও জাতীয় সংগীতে রূপ দেয়।[৯৩]

বঙ্গভঙ্গের বিরোদ্ধে অন্দোলন জোরদার করার জন্য ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। এটি প্রথমে পাটনার এক জনসভায় উচ্চারিত হয় এবং পরে ক্রমশ হিন্দুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ আন্দোলন দ্বিমুখী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, রাজনৈতিকভাবে এটাকে বঙ্গভঙ্গের বিরোদ্ধে এক শক্তিশালী ও কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আর অর্থনৈতিকভাবে এটাকে ভারতের বাধাগ্রস্ত দেশীয় শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানে ব্যবহার করা হয়।[৯৪] মুসলমানরা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনকে সঠিক মনে করলেও এটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানরা এ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হয়।

সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার অভিপ্রায় নিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের নিমিত্তে একটি কেন্দ্রিয় মুসলিম সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের

[৯২] *ড. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১*

[৯৩] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১*

[৯৪] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২*

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করতে এবং রাজনৈতিক ময়দানে যোগ্যতার পরিচয় দিতে ও বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের ঐক্য এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করতে ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্যও এ ধরনের একটি সংগঠন জরুরি হয়ে পড়ে।

১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলা ডেপুটেশনে যাবার জন্য এবং লর্ডমিন্টুর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপির জন্য লক্ষ্ণৌর বৈঠকে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক দল গঠনের আলোচনা গুরুত্ব পায়। ১৯০৬ সালে অক্টোবরে বিষয়টি পুনরায় সিমলায় ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হয়। অতঃপর ডিসেম্বরে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। এবং সেই মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ঢাকাতে নবাব সলিমুল্লাহ শাহবাগের সুরম্য বাগানে শুরু হওয়া শিক্ষা সম্মেলনের ৩০শে ডিসেম্বরের রাজনৈতিক অধিবেশনের বিশেষ সভায় নবাব সলিমুল্লাহ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা পেশ করেন।

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভিন্ন সম্প্রদায়গুলো থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।

হিন্দু সংবাদপত্রগুলি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার তীব্র সমালোচনা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকায় ইহাকে 'সলীমুল্লাহ লীগ'এবং সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি বলিয়া বিদ্রুপ কটাক্ষ করা হয়।[৯৫]

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ সুসংহতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠন উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখে।[৯৬]

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

[৯৫] *এম.এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪*

[৯৬] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬*

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস নেতৃত্ব বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে স্বদেশী আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছিল। বৃটিশ পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহবান জানিয়ে ১৯০৫ সনের ১৩ই জুলাই কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবণী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম'বয়কট' বা বর্জন আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই আগস্ট ১৯০৫ সনে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা বর্জন নীতি ঘোষণা করা হয়। সকল বৃটিশ পণ্য বিশেষত বস্ত্র, তাছাড়া লবণ, চিনি, সিগারেটএবং বিলাস সামগ্রী বর্জনের পিছনে যেমন একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় শিল্পোন্নয়ন বিধান এবং তেমনি দেশকে স্বনির্ভরশীল করে তোলা, অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করা। আন্দোলনকারীরা বুঝতেপেরেছিল যে, বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের মালিকেরা বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বার্থে বৃটিশ সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে।[৯৭]

শিক্ষালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। টেকনিকেল শিক্ষার সম্প্রসারণে জোর দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে বাংলা সাহিত্যেও জোয়ার আসে। এ সময়ে কবিগুরু রচনা করেন,"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"হিন্দু পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী' এবং মতিলাল ঘোষের "অমৃতবাজার" স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৯৮]

ইতোমধ্যে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কিছু বিপ্লবী ও গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠে। কলকাতার 'যুগান্তর' ও ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। যুগান্তরের মুখপাত্র যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমে যুব সমাজকে দলের দিকে আকৃষ্ট করা হয়। সমস্ত দেশে গুপ্ত সমিতির অনেক শাখা প্রশাখা স্থাপিত হয়। বাংলার গভর্নর ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্ট করা হয়। ১৯০৮ সনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী এ আন্দোলনে জীবন দান করে।

প্রধানত ঃ হিন্দুরাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালনা করতোএবং বঙ্গভঙ্গ রদ করাই ছিল তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কারণে অধিকাংশ মুসলমানই এ আন্দোলনকে সমর্থন করতো না। এ

---

[৯৭] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২*

[৯৮] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩*

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিতে কতিপয় মুসলমান যুবক এ আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু পরবতীকালে হিন্দু দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ ও 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত চালু করা হলে মুসলমানগণ ভীষণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিন্দু আন্দোলনে পরিণত হয়।[৯৯]

বঙ্গভঙ্গ রদ ও তৎপরবর্তী রাজনীতি

ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও বড়লাট লর্ডমিন্টো মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গ একটি চুড়ান্ত বাস্তবতা। তথাপি সরকার বৃটিশ বণিক ও কংগ্রেসী নেতাদের চাপে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করল না। **১৯১১** সালের আগস্ট মাসে নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত সচিব লর্ড ক্রুর কাছে বাংলাভাষী বিভাগগুলো যথা- প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন।[১০০] **১৯১১** সনের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক বিরাট আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার ভারতবাসী দিল্লীতে তাদের সাদর সম্ভাসন জানায় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে।সম্ভবত এই আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে হঠৎ করে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করেন।[১০১] বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে আবার কলকাতার প্রশাসনে আনা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানগণ চরম অসন্তোষ্ট হয় এবং তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। হিন্দু কংগ্রেসের আন্দোলনের জবাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা প্রবল বিক্ষোভের আয়োজনে সক্ষম ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আইন মান্যকারী সুশৃঙ্খল প্রজার ন্যায় আচরণ করে।[১০২]

---

[৯৯] *ড. আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপকথা, জে.কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৪৬৪*

[১০০] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬*

[১০১] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৬*

[১০২] *ইনাম-উল-হক, পৃ. ১৩৭)*

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণ হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতারা বঙ্গভঙ্গ রদকে স্বাগত জানায় ও উল্লাস প্রকাশ করে। কংগ্রেস সভাপতি অম্বির্কাচরণ মজুমদার বৃটিশ শাসকদের রাজনীতিবত্তার প্রশংসা করেন।

বাংলা বিভাগ রদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এ. কে. ফজলুল হক বলেন ঃ বঙ্গ বিভাগ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য নতুন আশার সম্ভার নিয়ে এসেছিল। দেশ বিভাগ রহিত করার প্রচেষ্টা ছিল এক শোকাবহ ভ্রান্তি; এ দেশের উন্নতি ও এখানকার মানুষের প্রগতির জন্য আমাদের যে আশা আকাংখা, এ প্রচেষ্টা সে সব আশা আকাংখার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।[১০৩] মুসলমানরা এটাকে রাজনৈতিক পরাজয় মনে করে হতাশ হয় এবং নিজেদের ভবিষ্যত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক মনে করে। মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মনোভাব জেগে উঠে। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় মুসলমানগণ যে কিরূপ মর্মাহত হয়েছিল, তা নবাবসলীমুল্লাহ ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাসনে ব্যক্ত করেন। দিল্লীর দরবারে বৃটিশ সরকার তাকে কে.সি.আই.ই. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। কিন্ত তিনি এই উপাধিতে ঘুষ ও তার গলায় অপমানের বাধন বলে মনে করেন।[১০৪]

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ পারিবারিক ঐশ্বর্য ও আরাম আয়েশের মধ্যে মানুষ হয়েও পূর্ববঙ্গের স্বজাতি মুসলমানদের তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। তাদের দুঃখ দুর্দশা তাকে পীড়া দিত। তাদের উন্নতির জন্য জনহিতকর কাজের স্বাক্ষর ও তিনি রেখেছেন। ঢাকার আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), মিডফোর্ট হাসপাতাল (সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ), সলিমুল্লাহ এতিমখানা এবং ঢাকা কলেজ হোস্টেল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) এসব তার কীর্তিময় স্বাক্ষর। নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াতে অত্যাধিক মর্মাহত হলেও তিনি সরকারের সাথে বুঝাপড়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গরদের বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি জনিয়েছিলেন।

১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন এবং তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে, নতুন প্রশাসনে

---

[১০৩] *সৈয়দ হাশিম রেজা, শেরে বাংলার ইন্তিকালে, মাহে নও, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,আষাঢ়, ১৩৬৯*

[১০৪] *Muhammad Abdur Rahim,the Muslim Socicty and politics in Bengal, The University of Dhaka, First Edition, November-1978, page. 219*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের স্বার্থসংক্ষণ করা হবে। প্রতিনিধিদলকে তিনি জানান যে, বিগত কয়েক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে ভারত-সরকার গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পূর্ব বাংলায় একজন বিশেষ শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ভারত-সচিবের কাছে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১০৫] সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নবাব সলিমুল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হিন্দুদের বিরোধিতার নিন্দা করেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ ও বিশেষ সুবিধার দাবি করেন।[১০৬] বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। সরকারের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আবেদন নিবেদনে রক্ষণশীল রাজনীতির পরিবর্তে প্রগতিশীল সংগ্রামী রাজনীতির উন্মেষ ঘটে। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে সুবিধাবাদী রক্ষণশীল এবং সামন্ত নেতাদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে।[১০৭]

এই নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর জনসম্পৃক্তিমূলক নেতৃত্ব। এই শ্রেণীর বাংলার রাজনীতি মঞ্চের প্রধান অসনটি দখল করেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

বঙ্গভঙ্গ রদ জনিত কারণে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব অন্যদিকে আলীগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে সরকারের অনীহা এবং কানপুরের মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে বেশ কয়েকজন মুসলমানকে গুলি করে হত্যা ইত্যাদি কারণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ বিরোধীতায় একমত হয়। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব

---

[১০৫] *সুফিয়া আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১*

[১০৬] *Muhammad Abdur Rahim , The Muslim Society and Politics in Bengal, Published by- The University of Dacca . First Edition- November, 1978, p.219*

[১০৭] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৮*

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন, সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচন এবং ভারতীয় করণের উপর জোর দেয়া হয়।[১০৮]

লক্ষ্ণৌ চুক্তির উল্লেখ যোগ্য ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলঃ

১. ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস একযোগে আন্দোলন করবে।

২. কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন হবে। এর মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ হবেন নির্বাচিত এবং একভাগ হবেন মনোনিত।

৩. নির্বাচিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ হবেন মুসলিম সদস্য এবং তারা মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।[১০৯]

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় যাতে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়। এ চুক্তিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। তাছাড়া ভারতের জন্য একটি সংবিধান রূপ রেখা তৈরী হয় এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষে একটি অসম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টু শাসন সংস্কারের পর ১৯১৯ সালে একটি নতুন শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়। এ আইন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মেন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন নামে পরিচিত।[১১০] ভারতীয় উপমহাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে আইনটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতসচিব মন্টেগু এবং গভর্ণর জেনারেল চেমসফোর্ডের উদ্যোগে প্রণীত হয় বলে এটি মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন নামেও পরিচিত। ভারত শাসনে ভারতীয়দের প্রত্যাশা পূরণ হয় এমন একটি দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠাই এ আইন প্রণয়নের বড় উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় মুসলমানদের অসন্তুষ্টি ও বিপ্লবীদের আন্দোলন প্রশমন, দ্যা ইন্ডিয়া প্রেস এ্যাক্ট (১৯১০), দি অ্যাক্ট অব-১৯১৩ কারণে রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষোভ নিবারণ, লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানদের

---

[১০৮] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, আগষ্ট ২০০৮, পৃ:৬৪*

[১০৯] *প্রাগুক্ত, পৃ:৬৪*

[১১০] *ড. আবঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ:৬৮*

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্ব শাসনের দাবি ইত্যাদিকে সামনে নিয়ে **১৯১৮** সালের আগস্ট মাসে বড় লাট চেমসফোর্ড 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট' নামে প্রখ্যাত সংস্কার আইন পাশ করেন। যার ভিত্তিতে **১৯১৯** সালের ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংস্কার আইনটি প্রণীত হয়।

গুরুত্বঃ

১. এ আইনে ভারতীয়দের কাছে সীমিত ক্ষমতা দেয়া হলেও পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের পথ এর মাধ্যমে সুগম হয়।

২. এ আইনে সংসদীয় পদ্ধতির দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৩. এ আইনে প্রথমবারের মতো দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন হয় যা সাংবিধানিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে।

৪. এ আইনে পূর্বের চেয়ে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হয়।[১১১]

খিলাফত আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন ছিল ভারতবর্ষে পরিচালিত হিন্দু মুসলিম মিলিত বৃটিশ বিরোধী একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলন চূড়ান্তরূপে স্বার্থক না হলেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এটি চেতনা জুগিয়ে ছিল। তুরস্ক ছিল মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। এর সুলতানকে মুসলমানগণ খলীফা বলে মান্য করত। প্রথম মহাযুদ্ধ জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তি পরাজিত হলে এর সাথে যুগ দেয়া তুরস্ককে যুদ্ধোত্তর খণ্ড বিখণ্ড করা হলে ভারতীয় মুসলমানগণ বিক্ষুব্দ হয়। খিলাফতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য **১৯১৯** সাল হতে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ যে আন্দোলন শুরু করেন তাই খিলাফত আন্দোলন। বাংলায় খিলাফত আন্দোলন একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে এতে অংশ নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন বাঙালী নেতৃবৃন্দ মাওলানা আকরাম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মজিবুর রহমান খান, মুহাম্মদ

[১১১] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ:৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহিল কাফী, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী, ঈসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাশেম, ফজলুল হক।[১১২]

খিলাফত নেতাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি খিলাফত কমিটিকে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের কাছাকাছি নিয়ে আসে।[১১৩] আন্দোলন প্রথমদিকে অহিংস হলেও ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশে চৌরিচৌরা থানায় জনতা আক্রমণ চালিয়ে একজন ইনসপেক্টর ও ২৫ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। আন্দোলন এমন সহিংস রূপ লাভ করায় গান্ধী এ আন্দোলন ত্যাগ করেন। কামাল আতাতুক কর্তৃক ১৯২৩ সালে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থা রহিত করলে খিলাফত আন্দোলনের অবসান ঘটে। খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বিশেষত মুসলমানদের মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলনের সাথে সাথে ১৯২০ সাল হতে মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক ভারতবর্ষ ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসন বিরোধী এক অহিংস সংগ্রাম ছিল এটি।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী অসহযোগের পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে-১. সরকারী খেতাব ও সম্মান সূচক উপাধি বর্জন, ২. সরকার অনুমোদিত স্কুল কলেজ বয়কট, ৩. বিচারালয় বর্জন, ৪. বিদেশি বস্ত্র বর্জন পেশ করা হয়।

সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু গঠনমূলক কর্মসূচী যেমন স্কুল, কলেজ ও আদালত বয়কটের পরিপূরক হিসেবে জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিসী ব্যবস্থার কথা বলা হয়। তাছাড়া চরকা কাটা, পঞ্চায়েত, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি সর্বোপরি অহিংসার উপর জোর দেয়া হয়।[১১৪] অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে সরকার বর্বরভাবে আন্দোলন দমন করে। ...লালা লাজপৎ রায়, মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসুসহ সকল প্রথম সারির

[১১২] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ:৮১*

[১১৩] *প্রাগুক্ত পৃ: ৮২*

[১১৪] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ:৯৩*

Dhaka University Institutional Repository

নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দমন নীতির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়।[১১৫]

১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরায় জনতার একটি শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে কিন্তু পুলিশের গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা থানার মধ্যে আশ্রয় নেয়। উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ বাহিনী বাইরে এলে তাদের ২২ জনকে হত্যা করে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় মর্মাহত হলে একই মাসের ২৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধী বারদৌলী প্রস্তাব অনুসারে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন।[১১৬] নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরপ্রেক্ষিতে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেনি।[১১৭] অসহযোগ আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থে প্রথম গণআন্দোলন যাতে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নিয়ে ছিল। এ আন্দোলন ভারতে প্রতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও দেশ প্রেমের বিস্তার ঘটিয়েছিল। বিদেশীদের উপর নির্ভশীলতার বদলে আত্মনির্ভশীলতা প্রতিক্ষেত্রে প্রসার ঘটে যা জাতীয়তাবোধ গঠনে সহায়ক হয়।[১১৮]

স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২২-১৯২৬)

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের মুখে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী নিয়ে চিত্তরঞ্জণ দাশ ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে 'স্বরাজ দল' গঠিত হয়। আইন সভায় অংশ নেয়া না নেয়া বিষয়ে মতভেদ থেকে ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চিত্তরঞ্জণ দাশ ৩১শে ডিসেঃ স্বরাজ দল গঠন করেন। তিনি এর সভাপতি এবং মতিলাল নেহেরু সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

---

[১১৫] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৫*

[১১৬] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৫*

[১১৭] *মোঃ এমরান জাহান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও সংবাদপত্র, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০০৮, পৃ. ১০*

[১১৮] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৯*

Dhaka University Institutional Repository

আইন সভায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে অব্যাহত প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারকে অকেজো করা এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বরাজ দল অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার পাশাপাশি স্বরাজ দল পৌরসভা ও কর্পোরেশনের নির্বাচনেও সাফল্য অর্জন করে।স্বরাজ দলের গঠনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল। স্বরাজদলের উদারনীতির কারণে মুসলমানরা ও এদলে এগিয়ে আসে এবং অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয়। স্বরাজ দল তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল। স্বরাজ দলের অসহযোগিতায় মন্ত্রীসভা পদত্যগে বাধ্য হয়েছিল। স্বরাজ দলের উত্থাপিত দমনমূলক আইনে রাজবন্দি মুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাব ৭৬-৮৫ ভোটে পাস হয়।

সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্স (১৯২৪ অক্টোবর) দ্বারা দমন ও চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু (১৯২৫ জুন) ইত্যাদি কারণে স্বরাজ দল চূড়ান্ত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট (ডিসেম্বর ১৯২৩)

স্বাধীনতা লাভে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের প্রয়োজন অনুভব করে বাংলার বঞ্চিত মুসলমানদের অধিকারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের সাথে ঐক্য প্রয়াসী হন। তিনি তাদের ন্যায্য দাবি গুলোকে সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বাংলার মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক, আজিজুল করিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্যাঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির ফলে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। স্বরাজদল ১৯২৩ সালের অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে বাংলায় ৩৯ টি মুসলি আসনের মধ্যে ২০ টি এবং হিন্দু আসনের মধ্যে ৩৬ টি আসন লাভ করে। এ চুক্তির ফলে ব্যবস্থাপক পরিষদ, কলকাতা কর্পোরেশনসহ প্রতিনিধিত্বকালীন সংস্থাগুলোতে মুসলমানরা বেশি পরিমাণে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

ইতিহাস গবেষক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"ব্রিটিশ ভারতে বাংলা চুক্তি বাঙ্গালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের চেতনা দান করে এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়নের পথিকৃত হিসেবে ভূমিকা পালন করে।"[১১৯]

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৯২৫- ১৬ জুন), ১৯২৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা উত্যাদি কারণে স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট আর টিকে থাকেনি।

নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর ১৪ দফা

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু মুসলি সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দলের সাথে মত বিনিময় করে একটি স্বরাজ শাসনতন্ত্র এর খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলিম লীগও দিল্লী প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের দাবিগুলে এ খসরা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার মত একটি সাব কমিটি গঠন করে।

এরই মধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয়দের সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার চ্যালেঞ্জ জানালে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে সর্বদলীয় কনফারেন্সে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯২৮সালের ১৯ মে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন রিপোর্ট আকারে প্রদান করে। এটিই প্রসিদ্ধ নেহেরু রিপোর্ট।[১২০]

নেহেরু রিপোর্ট হিন্দু মুসলিম অনৈক্যকে আরও বাড়িয়ে তুলে, মুসলমানদের চিন্তা ছিল যুক্ত নির্বাচনে বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার মারাত্মকভাবে বিপন্ন হবে। ব্রিটিশ সরকারও ১৯০৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে তাদের দাবি মেনে নেয়। ১৯১৬ সালের লক্ষৌ চুক্তিতে হিন্দুরাও তা গ্রহণ করে। কিন্ত নেহেরু রিপোর্টে এই দাবিকে ভালভাবে দেখা হয় নি।

মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এসময়ে ১৪ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। দাবীগুলোর মধ্যে প্রধানত ছিলঃ

---

[১১৯] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৯*

[১২০] *এম.এ রহিম বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০০৫, পৃ:১৯০*

Dhaka University Institutional Repository

১. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে;

২. প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা থাকবে এবং অতিরিক্ত আসন বিষয়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকবে;

৩. কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মুসলমানগণ পাবে;

৪. সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদেরও ন্যায্য অধিকার থাকবে;

৫. ধর্মকর্মে মুসলমানদের পূর্ণ অধিকার থাকবে।[১২১]

সাইমন কমিশন, গোল টেবিল বৈঠক ও ভারত শাসন আইন

বৃটিশ সরকার ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ভাইসরয় লর্ড ইরভিনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান কল্পে একটি কমিশন নিয়োগ করে। ভারতীয় কোন সদস্য এতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কংগ্রেস এ কমিশনের সাথে কোন সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিমলীগ একে বয়কট করে; কিন্তু লাহোরের মিয়া মোহাম্মদ শফীর নেতৃত্বাধীন লীগ এর সাথে সহযোগিতা করে।[১২২]

১৯৩০সালের মে মাসে সাইমন কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে।[১২৩]

কমিশন দ্বৈত সরকার (Dyarchy) বিলোপ, প্রদেশের হাতে ব্যাপক স্বায়ত্বশাসন, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, মুসলিম সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি রিপোর্ট করলেও কোন রাজনৈতিক দলের কাছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে দেশে বিক্ষোভ চলতে থাকে। অবস্থা নাজুক বিবেচনা করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত এক গোলটেবিল বৈঠক লন্ডনে আহবান করেন।

মুসলমানদের পক্ষে ফজলুল হক স্বায়ত্বশাসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে জোরদার বক্তৃতা দেন। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি ও ডিসেম্বর দু'বার এবং ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে ৩য় বারের গোলটেবিল

---

[১২১] *Qureshi, History of freedom movemet: উদ্বৃত, এম এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ:১৯১*

[১২২] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ:১৭৯*

[১২৩] *Kamruddin Ahmad , A Socio Political History of Bengal and The Birth Of Bangladesh , First Edition- April, 1967, p. 41*

Dhaka University Institutional Repository

বৈঠকে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক কোন মতৈক্য স্থপিত হয়নি। ইতোমধ্যে বৃটিশ সরকার ১৯৩২ সালের ২রা আগস্ট সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষণা করে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিয়ে আইন সভার আসন নির্দিষ্ট করে দেয়। বাংলাদেশে মুসলমানদেরকে ৪৮.৪ , হিন্দুদেরকে ৩৯.২ এবং ইউরোপীয়দেরকে শতকরা ১০টি আসন দেওয়া হয়।[১২৪]

এরপর বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। সকল সম্প্রদায়ের অধিকার, দেশীয় রাজাদের মর্যাদা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ প্রভৃতি এই শাসন আইনের উল্লেখযোগ্য বিধি ব্যবস্থার অন্যতম।[১২৫]

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি

মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য ৫৫ শতাংশ আসন, চাকুরিতে বিশেষ সুবিধা, ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন থেকে সালামি নামে হস্তান্তর ফিস প্রত্যাহার দাবি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দেয়। বাংলার মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ,কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রজা পার্টি গঠিত হয় যা পরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিতে পরিণত হয়।

১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। আবদুর রহিম এর সভাপতি এবং মাওলানা আকরাম খান এর সেক্রেটারী হন।[১২৬]

বাংলার মুসলমানদের স্বার্থে কৃষক প্রজা পার্টি যথেষ্ঠ কাজও করেছিল। ফজলুল হক ও আবদুর রহিমের নেতৃত্বে প্রজা পার্টি (১) পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় আইন, ১৯৩০ (২) মিউনিসিপ্যাল

[১২৪] *এম এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ:১৯২*

[১২৫] *এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ:১৯২*

[১২৬] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ:২০৪*

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী বিল, ১৯৩২ (৩) মহাজনী বিল, ১৯৩২ এবং (৪) চাষী ঋণ আইন, ১৯৩৩ ইত্যাদি পক্ষে সমর্থন জানান।[১২৭]

১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং হক মন্ত্রীসভা

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হয়। কৃষক শ্রমিক জনতার স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তায় দলটি ১১৯ টি সংরক্ষিত মুসলমান আসন হতে ৩৮ টি লাভ করে।[১২৮]

কিছু সংখ্যক বর্ণ হিন্দু ও তফসিলী হিন্দু সভ্য ফজলুল হককে সমর্থন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে গভর্নর কর্তৃক তিনি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হন। ফজলুল হক প্রজা-লীগ যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করন। স্যার খাজা নাযিমুদ্দিন, নবাব হাবিবুল্লাহ, এইচ.এম. সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার নালিনীরঞ্জন সরকার, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, মুকুন্দুবিহারী মল্লিক ও প্রসন্নদেব রায়কট এই কয়জন সদস্যকে নিয়ে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১২৯]

ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বয়ত্বশাসন সুন্দরভাবে চলছিল। তাতে তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্য আদর্শস্থল হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ ফজলুল হকের সাহস ও কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং তারা তাকে শেরে বাংলা নামে আখ্যায়িত করেছিল।

লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে (১৫ অক্টোবর, ১৯৩৭) ফজলুল হক শেরেবাংলা ধ্বনি দ্বারা সমর্থিত হন।[১৩০] ফজলুল হক ব্যাপক জনহিতকর কাজ করেন। ১৯৩৮ সালে ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন, ১৯৩৯ সনে প্রজাসত্ব আইন পাশ, বঙ্গীয় কুসিদজীবী আইন পাশ ইত্যাদির মাধ্যমে ফজলুল হক কৃষকদের রক্ষা করেন। মুসলমানদের জন্য সকল দফতরে শতকরা ৫০টি সংরক্ষিত করে দেন।

---

[১২৭] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ:২০৫*

[১২৮] *এম এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ:২০০*

[১২৯] *এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ:২০১*

[১৩০] *এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ:২০১*

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন সংশোধন করে এর পরিচালনায় মুসলমানদের জন্য তিনি সুযোগ সৃষ্টি করেন।

১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমর পরিষদে (War Counsel) প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদাধিকার বলে ফজলুল হক সদস্য হওয়ায় জিন্নাহর সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে লীগ মন্ত্রীরা একযোগে মন্ত্রী সভা হতে পদত্যাগ করলে দ্বিতীয় বারে তিনি হিন্দু মন্ত্রীসভা ও ফরওয়ার্ড ব্লককে সাথে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তা-ই 'শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব' নামে পরিচিত।[১৩১]

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরনীয় দিন। এসময় জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয় ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (Separate States) গঠনের দাবি জানানো হয়। স্বয়ং ফজলুল হক এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১৩২] প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বারা মুসলিমলীগ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে এবং দ্বিজাতির ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি জানায়।[১৩৩] লাহোর অধিবেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে দৈনিক আজাদে লিখা হয়, এই অধিবেশনে লীগের নীতিকে নূতনভাবে লক্ষ্যাভিসারী করার ফলে মোছলেম জাগরণের ইতিহাসে এক নবযুগ সূচিত হয়েছে।[১৩৪]

---

[১৩১] *ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৪*

[১৩২] *ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩৪*

[১৩৩] *এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৯*

[১৩৪] *দৈনিক আজাদ ২৩ শে মার্চ ১৯৪০, উদ্ধৃত, শামসুন নাহার: বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ সাময়িক পত্রের ভূমিকা (১৯০৬-৪৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, আগস্ট ২০০২, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃ: ১৭১*

Dhaka University Institutional Repository

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিমলীগ উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগুরু এলাকায় একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করেছিল। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল।[১৩৫] হিন্দুদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহানত্মা গান্ধী একে পাপ বলে অভিহিত করে। হিন্দুগণ মনে করে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।[১৩৬]

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা ও পাকিস্তান আন্দোলন (১৯৪৩-১৯৪৬)

বাংলার গভর্নর জন হার্বাট ১৯৪৩ সালের ১৩ এপ্রিল মুসলিম লীগের স্যার নাজিমুদ্দিনকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করার অনুমতি প্রদান করেন। মন্ত্রিসভায় ১৩ মন্ত্রী ও ১৭ জন সেক্রেটারী নেয়া হয়। এটাকে বেঙ্গল কোয়ালিশন ও বলা হয়। এই মন্ত্রীসভাকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৪৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩৫০) সংগঠিত এই দুর্ভিক্ষ ছিল বাংলার ইতিহাসে এক ভয়াবহ মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ। সরকারি হিসাব মতে, এ দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষে। বেসরকারী হিসাব মতে, মৃতের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। এতদসত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিচালিত লঙ্গরখানায় ক্ষুধিত লোকদেরকে একবেলা বিনামূল্যে আহার সরবরাহের মাধ্যমে লোকদের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন খাদ্যমন্ত্রী। এতদসত্ত্বেও এসময় বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু প্রভাবমুক্ত একটি স্বধীন দেশ চেয়েছে। ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।[১৩৭]
১২৭৬ বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ত্রিশ লক্ষ।[১৩৮]

১৯৪৬ এর নির্বাচন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা

---

[১৩৫] *এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২১*

[১৩৬] *এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২১*

[১৩৭] *এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৫)*

[১৩৮] *আখতার মুকুল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ক্রমবিকাশ ; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জুন, ১৯৮৬, উদ্বৃত মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের.... পৃ:২১২, পাদটীকা*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের সকল প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেই নির্বাচন ছিল অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের ব্যাপক উত্থান পরিদৃষ্ট হয়। বাংলার সাধারন মুসলমানদের নিকট মুসলিমলীগের পতন বা উন্নতি তাদের সম্প্রদায়েরই পতন বা উন্নতি বলে বিবেচিত হতে থাকে।[১৩৯]

নির্বাচনে ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন সভায় প্রাদেশিক মুসলিম ১২২ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪ টি আসন লাভ করে। বাকি আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি ৪টি, স্বতন্ত্র ৩টি লাভ করে, মুসলিম লীগ মোট আসনের ৯৩% লাভ করে।[১৪০]

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল, ৮ সদস্যের মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং উক্ত সনের নভেম্বর মাসে তা ১৩ তে উন্নীত করেন। ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই মন্ত্রিসভার সময় কালে দেশ বিভাগ সংগঠিত হয়। ফলে এই মন্ত্রিসভা অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল। যে বিরাট আশা নিয়ে জনগণ মুসলিমলীগকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন অত্যল্পকালের মধ্যে সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়। মুসলিম লীগের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। কারণ মুসলিম লীগ একচ্ছত্র ক্ষমতা খাটিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের (Independent Stats) এর স্থলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্ব শাসন থেকে বঞ্চিত করে।[১৪১] ফলে আশাহত মানুষ দলে দলে মুসলিমলীগের ছায়াতল থেকে সরে দাঁড়ায়।

ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার অনুধাবন করে নিল মুক্তি পাগল সংগ্রামী জনতার দাবি মেনে ভারতের স্বাধীনতা দিতেই হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির ফেব্রুয়ারী

---

[১৩৯] *উদ্ধৃত, শামসুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯*

[১৪০] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ:নং: ১৬৬*

[১৪১] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪*

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণায় (১৯৪৭) পর এটি একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর ঘোষণায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয় হাতে "ক্ষমতা হস্তান্তর করতে মহামান্য সম্রাট দৃঢ়সংকল্প।"[১৪২] ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই লন্ডনের কমন্সসভা ঘোষণা করে যে, আগামী মাসের মধ্যে ভারতে "ভারত পাকিস্তান নামে পরিচিত দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন" প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের অধীনে একটি সীমানা নির্ধারণ কমিটি (Boundary Comission) দুই দেশের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেবেন।"[১৪৩]

ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন হিন্দু মুসলিম বিভক্তির সুষ্ঠ সমাধান হিসাবে ভারত ও পাকিস্তান নামক আলাদা রাষ্ট্রকে বিকল্প বলে অনুভব করেন। সর্দার প্যাটেলে ও কংগ্রেসের বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির প্রস্তাব জিন্নাহ মেনে নিয়ে পাকিস্তান চাইলেও ইতোমধ্যে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি সার্বভৌম, স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব করেন।[১৪৪]

পরিশেষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্টের সৃষ্টি হয়। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন যথাক্রমে জওহরলাল নেহেরু ও লিয়াকত আলী খাঁন। ৭ আস্ট জিন্নাহ ভারত থেকে করাচি যান এবং আইন পরিষদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। পরিষদ তাঁকে কায়েদে আযম উপাধিতে ভূষিত করে। মাউন্টব্যাটেন ১৪ আগস্ট আইন পরিষদে বক্তৃতা দেন। অন্যদিকে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নতুন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষ ১৯০ বছর পর স্বাধীন হয়।

ভাষা আন্দোলন

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে সর্বপ্রথম ব্যাপক বিতর্ক ও সংঘাতের সূচনা করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দান ক্রমশ উত্তেজিত হয়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬০% বাংলা, ২৮.০৪%

---

[১৪২] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৮*

[১৪৩] *প্রাগুক্ত: পৃ:২৪১*

[১৪৪] *মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪০*

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবি, ৫.৮%সিন্ধি, ৭.১% পশুত, ৭.২% উর্দু এবং বাকী ১.৮% ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিক।[১৪৫]

পরিসংখ্যান গত দিক থেকে বিস্তর ব্যবধানে উর্দুর চেয়ে পাকিস্তানের অনেক বেশী সংখ্যক মানুষ বাংলায় কথা বললেও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে চরম অবজ্ঞা করে উর্দুকে মাতৃভাষা করার ঘোষণা দেয়।[১৪৬] ছাত্র জনতা জিন্নাহর বক্তব্যকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাক্ষাণ করে। শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন। আন্দোলনের প্রথম স্তরেই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধান হয়ে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারিতে তিনি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে এক জনসভায়,

"উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা করেন। আবার সংগ্রাম শুরু হয়- প্রদেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকাল থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। কিন্তু ২১শে তারিখে ঢাকার ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলি চালায়। বহু ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। শহীদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাশের ছাত্র আবুল বরকত এবং সালাম, রফিকসহ অনেকে ছিলেন। সারা প্রদেশে মাতৃভাষার দাবিতে সর্বত্র গণবিক্ষোভ চলতে থাকে। বহু ছাত্র, শিক্ষক, জননেতা গ্রেফতার হন। সর্বত্র ধড়পাকড় শুরু হয়। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে সেই দিনের বাঙ্গালির আত্মত্যাগ যথার্থই অতুলনীয় ছিল।

শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, তাঁরা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন। প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন স্বয়ং বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশে প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত সফল গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

---

[১৪৫] *ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৩*

[১৪৬] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫৪*

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯)

বাংলা ভাষা আন্দোলন প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতাদের বিতর্কিত ভূমিকা, পাকিস্তানী শাসকচক্রের স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ইত্যাদি কারণে বাংলার জনদরদী নেতাগণ সরকারের বিরোধী হিসাবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। আওয়ামী অর্থ জনগন। সেই হিসেবে এর অর্থ হয় জনগনের মুসলীম লীগে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষাণী এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যে মাওলানা ভাষানী ও সোহরাওয়ার্দীর এবং টগবগে যুবক নেতা শেখ মুজিব রহমানের যোগ্য নেতৃত্বে এবং ছাত্র সমাজের সক্রিয় সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে এই দল বাঙালির মধ্যশ্রেণির সংগ্রামী কণ্ঠস্বররূপে পরিগণিত হয়।[১৪৭]

অর্থনীতি

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি

[১৪৭] *ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ:নং: ৪৫*

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সর্বত্র জনসংখ্যার অধিকাংশ সবসময়ই জীবন যাপনের জন্য ভূমির উপর নির্ভশীল। এটি সমগ্র বাংলার জন্য বিশেষ করে প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য অধিক প্রযোজ্য।[১৪৮] উনবিংশ শতাব্দীতে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী লোক কৃষি নির্ভর ছিল।[১৪৯] ১৯০১ সালে আদম শুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলার কৃষিজীবীদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। এতে আরও দেখা যায় যে এদের অধিকাংশই চাষী, জমির মালিক নয়। ভূমিহীন চাষীর অনুপাত ও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রতি দশ হাজার মুসলমানদের মধ্যে অন্তত ৭,৩১৬ জন ছিল চাষী এবং ১৭৩ জন ছিল জমির মালিক। হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৫৫৫ এবং ২১৭ ।[১৫০]

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কৃষির উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৫ সালে বাংলায় প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ খোলার পর ভালভাবেই কৃষির উন্নায়নের জন্য চেষ্টা করা হয়।[১৫১] উন্নত বীজ, উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রদর্শনী ও কৃষি মেলার আয়োজন ইত্যাদি ব্যবস্থা কৃষি বিভাগ গ্রহণ করে। সে সময়ই জমিতে সার প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গোবর সারে উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। এরপর বেশি উৎপাদনকারী সার হল- খইল। উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক সার অজানা ছিল।[১৫২]

বাংলার কৃষকদের অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। কৃষকদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ঋণদাতা মহাজনদের নিকট বিপুল অঙ্কের ঋণে আবদ্ধ থাকত। পূর্ব বাংলার কোন কোন জেলার কৃষকদের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তারা প্রকৃত পক্ষে তেমন সমৃদ্ধশালী ছিল না, তবুও সাধারণত ঋণগ্রস্থ থাকলেও তাদের অবস্থা মোটামুটি আরামদায়ক ছিল। উদাহরণ হিসাবে আমরা পূর্ব বাংলার ঢাকা বিভাগকে বিবেচনা করতে পারি। এই জেলায় এই রায়তদের গড় জমির পরিমান ছিল প্রায় ৯ একর এবং এই জমি থেকে সাধারণত তারা বৎসরে ৯৪০০ পাউন্ড পরিষ্কার চাল পেত। একজন কৃষক পরিবারে সাধারণত ৮ জন সদস্য ছিল এবং প্রতিজন প্রতিদিন প্রায় ১.৫ পাউন্ড চাল খেত।

---

[১৪৮] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 99*

[১৪৯] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১১০০, ডিসেম্বর-২০০০, পৃ.৩২*

[১৫০] *Sufia Ahmed. Ibid, p. 52*

[১৫১] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩*

[১৫২] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪*

Dhaka University Institutional Repository

এই হিসেবে প্রতি পরিবারে বার্ষিক চাল খরচ ছিল ৪৩৮০ পাউন্ড। অতিরিক্ত ৫০২০ পাউন্ড চালের মূল্য ছিল ১৭৯ টাকা, যা তারা বিক্রি করত অথবা বিনিময় করত। এই সকল পরিবার গড় বিক্রি থেকে আনুমানিক ১৮ টাকা এবং ৬৬ একর জমিতে চাষকৃত পাট থেকে ৭২ টাকা পেত। অর্থাৎ একটি কৃষক পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ছিল ২৬৯ টাকা।[১৫৩]

১৭৯৩ সালে ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কাঙ্খিত কোন সাফল্য আসেনি। জমিদাররা ভূমির উন্নয়ন করে নি এবং তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে নি। পক্ষান্তরে কৃষকদের উপর করের বিশাল ভার চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে জমিদার ও কৃষকের মাঝে বৈরিতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তার একটি জলন্ত উদাহরণ ১৮৭৩ সালের পাবনা বিদ্রোহ।[১৫৪]

স্থায়ী রায়াতদের নিরাপত্তা, জমিতে উৎপাদনের বর্ধিত মূল্যের একটি ন্যায্য অংশ জমিদারের প্রাপ্তি এবং জমিদার ও প্রজার বিরোধ মিমাংসা সাধারণ নীতিকে এই তিনটি মূল বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ১৮৮৫ সালে Bengal Tenancy Act পাশ হয়। তবে জমিদার ও রায়তদের বিরূদ্ধে চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষেত্রে এই বিল অপর্যাপ্ত থেকে যায়।[১৫৫] নিগৃহীত রায়তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের একমাত্র মুসলমান সদস্য আমীর আলী রায়তদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ১৯৩০-এর দশকে এ বৃদ্ধির গতি তীব্র রূপ ধারণ করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ব্যাপক হারে মৃত্যুর ফলে ১৯৪০- এর দশকে এ গতি হঠাৎ থেমে যায়।[১৫৬]

এ পর্যায়ে উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি কৌশল উদ্ভাবনের জন্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্যোগ সুস্পষ্টরূপে সফল হতে পারে নি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মোট কৃষিউৎপাদন বার্ষিক মাত্র ০.৩% বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন স্থির থাকে। এ সময়ে জনসংখ্যা বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার হৃদয় হিসেবে পরিচিত বর্ধমান বিভাগে প্রকৃতপক্ষে ১.০ শতাংশ নেতিবাচক উৎপাদনহার দেখা যায়। প্রেসিডেন্সি বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনবৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ সম্ভবত খুলনার সুন্দরবন

---

[১৫৩] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 114*

[১৫৪] *Sufia Ahmed, Ibid, p.no:104*

[১৫৫] *Sufia Ahmed,Ibid, p. 108, 109*

[১৫৬] *সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, পৃ:নং: ৭৬*

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা ও চব্বিশ পরগনায় অনাবাদি জমি আবাদের ফল। পূর্ব বাংলার ঢাকা বিভাগে বার্ষিক উৎপাদন ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ০.৭ শতাংশ হারে উৎপাদন হ্রাস পায়। উত্তর বাংলার জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত রাজশাহী বিভাগের উৎপাদন বার্ষিক ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।[১৫৭] বাংলার কৃষকগণ ১৮৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকের মধ্যে বিশ্বঅর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রশস্ত, পরস্পর নীচের ধাপে স্থান পায়।

যখন ভূমি ও শ্রমবাজারকে পশ্চাতে রেখে উৎপন্ন বাণিজ্য ও মূলধন বাজার সম্প্রসারণে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। তখনও এ গ্রামীণ উৎপাদকশ্রেণি তাদের স্বতন্ত্র সম্পর্ক ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী গিলাফে আচ্ছাদিত একটি প্রকৃত কৃষিজীবী সমাজই রয়ে যায়।[১৫৮]

নীল

স্বরণাতীত কাল থেকে ভারতে নীল চাষ হতো এবং ভারতীয়রা নীল রঙ প্রস্তুত করে বিদেশে রফতানী করত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে রফতানী আরম্ভ করে।[১৫৯] উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নীলকর ও নীল চাষীদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নীলকররা তাদের নিজেদের লাভে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে। ফলে কৃষকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এই অবস্থা বিদ্রোহে রূপ নেয়। নীল চাষীরা নীল চাষ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৮৫৯-৬০ সালে কৃষ্ণ নগরের নিকট চৌহাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাংলার সকল জেলায় বিদ্রোহ করে। ১৮৬০ সালে সরকার বিষয়টি সম্পর্কে অভিহিত হওয়ার জন্য নীল কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। ঐ বছরই কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। নীল কমিশন নীল চাষ সম্পর্কে বহু ত্রুটি প্রকাশ করে।[১৬০]

নীল চাষ করে চাষীরা যথাযতথ মূল্য পেত না। নীলকররা গ্রামগুলোর ইজারা নিয়ে চাষীদেরকে নীল চাষে বাধ্য করতো। সেগুলোর মধ্যে গুরুতর হলো খুন, জখম, শারীরিক নির্যাতন, নারী হরণ,

---

[১৫৭] *সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ:নং: ৭৬*

[১৫৮] *সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ:নং: ৮৫*

[১৫৯] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪*

[১৬০] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬*

Dhaka University Institutional Repository

কুঠিতে কয়েদ রাখা, রাহাজানি ও অপহরণ।[১৬১] দীন বন্ধু মিত্র রচিত নীল দর্পন নাটক নীল করদের অত্যাচার চিত্রিত হয়। পাদ্রী জেম্‌স-লং ইংরেজীতে অনুবাদ করে নাটকটি মঞ্চস্থ করার কারনে কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন।[১৬২] নীলরদের অত্যাচারের বিরোদ্ধে নিপীড়িত কৃষকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বিশ্বনাথ সরদার, শিবনাথ প্রতিরোধ আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছিলেন। টাঙ্গাইলের উত্তাল যমুনা নদীর তীরবর্তী চুয়াবাড়ি-বাঘিল অঞ্চলে জনৈক ভবানী মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান কৃষক-লাঠিয়াল বাহিনী নীলকরদের নৌকার দড়ি দিয়ে বেঁধে যমুনার অপর তীরে সিরাজগঞ্জ ছেড়ে দিয়ে এসেছিল এবং নীল কুঠি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।[১৬৩]

পাট চাষ ও পাটকল শিল্প

ভারতবর্ষে পাট চাষের ইতিহাস বহুকাল পূর্বের। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষ আরম্ভ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশ সমূহে ও ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলার কৃষকেরা পাট চাষের এলাকা বৃদ্ধি করে।[১৬৪] বাংলার বিশেষত পূর্ব ও উত্তর বাংলার রায়তরা অবস্থা সম্পন্ন হওয়ার প্রধান কারন ছিল ঊনিশ শতকের শেষ ২৫ বছরে পাট চাষের বিস্তৃতি।[১৬৫]

১৮৭২-৭৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলায় সে সময় ১০লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হতো। ১৯০৭-০৮ সাল নগাদ এই পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৮০ হাজার একরে দাড়াঁয়।[১৬৬] ১৮৯১/৯৫ সালে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, বগুরা, পাবনা, রংপুর, ঢাকা ও রাজশাহী কার্যত জমির শতকরা ৮ ভাগ এবং তার অধিক জমিতে পাট চাষ করতো। ১৮৯১/৯৫ – ১৯১০/১৪ সময়কালে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, বগুরায় সম্প্রসারণের হার বেশী। আর উল্লেখ্য যে, ১৯১০/১৪ সালে রংপুর , ঢাকা, পাবনা, ত্রিপুরা,

---

[১৬১] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০*

[১৬২] *গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া,: বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৫, পৃঃ ২৩*

[১৬৩] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২*

[১৬৪] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯*

[১৬৫] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 118*

[১৬৬] *Report of the Bengal jute Enquiry Committee 1939, vol.1, p.7, Quoted, Sufia Ahmed,Ibid, p. 119*

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া ও ময়মনসিংহের কৃষকরা জমির শতকরা ১৮ ভাগ হতে ২৮ ভাগ জমিতে পাট চাষ করতো। এসব জেলাতেই ছিল পাট চাষের প্রধান কেন্দ্র।[১৬৭] পাট ছিল এই প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল। পাটের আঁশ থেকে হাতে চরকা কেটে ও তাতে মোটা কাপড় তৈরি একটি পুরানো ভারতীয় শিল্প। ১৮৫৪ সালে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী রিশরায় একজন ইংরেজ ভারতে প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। শীঘ্রই এ দৃষ্টান্ত অন্যরা অনুসরণ করে এবং সত্তরের দশকে ভারত থেকে পাট রফতানী ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিকটবর্তী সময়ে এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং ১৯০৬ সালের মধ্যে বাংলায় ৪৩টি ও বোম্বাইয়ে ১টি পাটকল স্থাপিত হয়।

স্থানীয় পাটকলগুলো কাঁচা পাটের বিপুল অংশ ব্যবহার করে এবং একই সঙ্গে বিদেশে কাঁচা পাট রফতানিও বৃদ্ধি পায়। কাঁচা পাটের এই চাহিদা কৃষকদের হাতে অর্থ এনে দেয় এবং ঊনিশ শতকের শেষ বছরগুলি থেকে পাটের দাম বৃদ্ধি পেলে অর্থও বৃদ্ধি পায়। এভাবে পাটের চাষ কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করে।[১৬৮]

১৮৭২ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পাট চাষের প্রচুর সম্প্রসারণ ঘটে। পাট চাষের জমির উৎস হলো তিনটি। যথা- পতিত জমি, নীলের জমি ও দোফসলী জমি। প্রথম দিকে পতিত জমি ও নীলের জমি এবং শেষের দিকে দোফসলা জমি পাট চাষের উৎস ছিল।[১৬৯] পাটকল শিল্প বাংলার একটি আধুনিক শিল্প। আধুনিক শিল্প বিকাশের পূর্বে বাঙালিরা হস্ত চালিত যন্ত্রের দ্বারা পাটের দাঁড় ও চট তৈরি করতো। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর এইগুলি বিদেশে রফতানি করা হতো।[১৭০] ১৮৩৫ সালে ডান্ডি যন্ত্রের সাহায্যে দড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়। ডান্ডিতে যান্ত্রিক উপায়ে দড়ি তৈরির বিশ বছর পর বাংলায় পাট শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।

১৮৫৪ সালে রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তলোন আরম্ভ হলে যন্ত্র চালানোর জন্য কয়লা পাওয়া যায়। পাটকল শিল্প বিদেশী-মূলধনকে আকর্ষণ করে।[১৭১] জর্জ অকল্যান্ড বাংলায় প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুই বছর কেবল দড়ি তৈরি করে। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রতিদিন ৮ টন।

---

[১৬৭] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১*

[১৬৮] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 119,120*

[১৬৯] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২*

[১৭০] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩*

[১৭১] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪*

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ হেন্ডারসন নামক আর একজন স্টটল্যান্ডবাসীর উপদেশে বোর্নিয় কোম্পানী পাটকল শিল্পে আত্মনিয়োগ করে। ১৮৫৯ সালে কোম্পানী দড়ি কাটা ও শক্তি চালিত তাতে চট তৈরী আরম্ভ করে। প্রথম থেকেই এই কোম্পানী উন্নতি করে। পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানী যন্ত্রপাতি দ্বিগুণ করে এবং তের বছরের মধ্যে মূলধনের দ্বিগুণ আয় করে।[১৭২] প্রথম মহাযুদ্ধ পাটকল শিল্পকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যায়। বিদেশে কাঁচা পাট রফতানির সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়ায় কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে, যুদ্ধের সময় বালির বস্তা, পণ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য বস্তা ও চটের চাহিদা বেড়ে যায়। যুদ্ধের সময় পাটকল গুলি প্রচুর উৎপাদন করে। ১৯১৫-১৬ থেকে ১৯১৭-১৮ সময়কালে পাটকল বছরে ৪৬ লাখ বেল কাঁচা পাট ব্যবহার করে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর উৎপাদনের হার কিছুটা হ্রাস পায়।[১৭৩]

১৯২৫ সালের পরে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং অধিক লাভের আশায় পাটকল সংস্থার বাইরে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।[১৭৪] ১৯২০ -এর দশকের শেষ ও ১৯৩০ -এর দশকের প্রথম দিককার চিত্র থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদিত কাঁচা পাটের ৫০% -এরও বেশি পাটকলগুলিতে চলে যায়। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্য পশ্চিম ভারতীয় তুলা উৎপাদনের তুলনায় ব্যাপক ছিল। এটি বৃটিশ আমলাবর্গের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলেও পরোক্ষ সহযোগিতা পায়। তবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু প্রবেশাধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত করে।[১৭৫]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে যখন কাঁচা পাটের মূল্য একেবারে নিচে নেমে আসে, তখন ফসল তোলাকালীন মূল্য এবং চট ও থলি জাতীয় উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ও অর্থসংস্থানকারী কিংবা প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে কেউই পাটের মূল্যহ্রাসজনিত পরিস্থিতির প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি।

---

[১৭২] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩*

[১৭৩] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬*

[১৭৪] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬*

[১৭৫] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯/৮০*

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রধানত আর্থিক ক্ষেত্রে কতিপয় নীতিনির্ধারণমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে এ সংকট তীব্র করে তুলতে ইন্ধন যোগায়।[১৭৬]

১৯৪৩ সালে পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়াস দেখা যায়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ এর দশকে পাট সামগ্রী উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের সাহায্যে ঐতিহ্যবাহী ধারা বহাল থাকে।[১৭৭]

শিল্প ও শিল্পজীবী

বাংলার প্রায় ১০.৩৩ শতাংশ মানুষের জীবন সম্পূর্ণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল,[১৭৮] দেশীয় শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল ঃ

১. কাঠের কাজ ও আসবাবপত্র;

২. লোহা, তামা ইত্যাদি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি ও কামারের কাজ;

৩. পাটি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি;

৪. চামড়া শিল্পের কাজ;

৫. মৃৎ শিল্প;

৬. তাঁত ও বস্ত্র শিল্প।[১৭৯]

দেশীয় শিল্পে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই সম্পৃক্ত ছিল। তথাপি কিছু শিল্প মুসলমানদের নিকট অগ্রাধিকার পেত। যেমন চামড়া শিল্পে মুসলমানদের আগ্রহ ছিল। কাজের অপরিচ্ছন্ন অংশগুলো তারা চামাড় বা মুচিদের দিয়ে সমাধা করাত। তারা নিজেরা ব্যস্ত ছিল জবাই, গোসত-বিক্রি, চামড়ার ব্যবসায় প্রভৃতি নিয়ে।[১৮০]

---

[১৭৬] *সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত: পৃ:নং: ৮৪*

[১৭৭] *Millat. 12 July 1946, প্রাগুক্ত, পৃ:৮৫*

[১৭৮] *Sufia Ahmed, Ibid, p. 124*

[১৭৯] *Report of the Indian Fanine Comission 1898, p:150 এর উদ্ধৃতিতে Sufia Ahmed, Ibid, p. 124,125*

[১৮০] *Buchanam, D.H, op. cit, p: 80 এর উদ্ধৃতিতে , Sufia Ahmed, Ibid, p.126*

Dhaka University Institutional Repository

আসবাবপত্র তৈরি ও নির্মাণ শিল্পে ও মুসলমানরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লষ্করদের মধ্যে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এ- পেশাজীবীদের পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ। জাহাজ ও স্টিমারের অন্যান্য কাজেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বাংলায় দর্জিদের মধ্যেও মুসলমানরা অনেক বেশী ছিল। এ পেশায় মুসলমান-হিন্দু অনুপাত ছিল ৮:১। অন্য যে সকল পেশায় মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল; তাদের মধ্যে ছিল রঙকার, রাজমিস্ত্রি, রেশম গুটির চাষী ও রেশম সুতার কাজে কর্মী, হোটেল ও বিশ্রামাগার কর্মী, পশু চিকিৎসক ও অশ্ববৈদ্য, ঘোড়া-হাতির প্রশিক্ষক, হুঁকা তৈরি কারক, কাঁচের চুড়ি তৈরিকারক ও বিক্রেতা, বই বাঁধাইকারী, সিল্ক তৈরির তাঁতি, সবজি ও ফল বিক্রেতা, ঘরের চালের মিস্ত্রী, তাঁতি প্রভৃতি, তুলা থেকে সুতা তৈরির কাজে নিযুক্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিপুল।[১৮১]

গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশী ছিল তাঁত। বলা হয় যে,

"Next to agriculture, it has been remarked; it provides employment, directly or indirectly, to the vast majority of the people."[১৮২]

হিন্দুদের মধ্যে যারা সুতার কাপড় তৈরি করত তাদেরকে তাঁতি, তন্তুকায় এবং যোগী প্রভৃতি নামে ডাকা হতো। মুসলমানরা এক্ষেত্রে জোলা ও কখনও মোমিন নামে পরিচিত ছিল।[১৮৩] মুসলমান তাঁতিরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত নিচু সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল। তারা সাধারণত স্বীয়-পেশাজীবীদের মধ্যেই বিয়ে করত। তাঁতিরা ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর এবং জোলা নামটি নিন্দার্থক রূপেই বিবেচিত হতো। আচরণ অসংস্কৃত মানুষদের প্রতি অনেক সময় এই নামটি প্রয়োগ করা হতো।[১৮৪] যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র প্রচলনের ফলে তাঁত শিল্প মার খায় এবং তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অসন্তোষজনক হয়ে ওঠে। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলন তাঁতিদের কিছুটা স্বস্তি দেয়।[১৮৫]

---

[১৮১] *Sufia Ahmed, Ibid, p.no: 126-127*

[১৮২] *Gupta, G.N. op. cit, p.2 এর উদ্ধৃত, Muslim Community, p:127*

[১৮৩] *Banerjei, N.N; Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal p.7. p.16* এর উদ্ধৃতিতে *(Sufia Ahmed, Ibid, p.127*

[১৮৪] *Sufia Ahmed, Ibid, p.128*

[১৮৫] *Sufia Ahmed,Ibid, p.129*

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতিদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে- যারা নিজেদের মূলধনে কাজ করত এবং যারা কাঁচামালের জন্য মহাজনের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলার অধিকাংশই ছিল দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর এবং মূলত এর ফলেই এ শিল্পে কোন মজুরি বৃদ্ধি ঘটেনি।[১৮৬]

কুটির শিল্পের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কারুশিল্পীদের সাধারন অবস্থা খুব সম্পন্ন ছিল না। ১৮৯১-৯২ সালের হিসেবে দেখা যায় যে মজুরী হিসেবে যে অর্থ দেয়া হতো তা খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফলে কারুশিল্পীদের কোনো মতে জীবনধারন করতে হতো।[১৮৭]

তবে বেঁচে থাকার তাগিদে হলেও শিল্পের প্রতিটি অঙ্গনে মুসলমানরা ক্রমে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলছিল। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 'বঙ্গের মোসলেম শক্তি: সমাজ জীবন' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে,

"অভাবের তাড়াতেই হউক অথবা অদম্য প্রাণশক্তির উন্মাদনাতেই হউক, মুসলমানেরা ধীরে ধীরে পল্লীর সমস্ত শিল্প বানিজ্যগুলিকে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া লইতেছে। পল্লীতে আজকালসর্বত্রই মুসলমান কলু গৃহস্থের ঘরে তৈলের জোগান দেয়। মুসলমান মাঝিরও অভাব নাই। পূর্ববঙ্গের মুসলমান মাঝি শুঁট্‌কী মাছের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইতেছে। ঢাকার মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীর ঐশ্বর্য্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়- হাড়ের ব্যবসায়েও প্রায় তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তদুপরি ইমারতের কাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহশিল্পের কার্য্যে তাহারা যেভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহাতেই স্পষ্টই অনুমান হয়–কিছুদিন পরে হিন্দু গৃহশিল্পীদের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে। বর্তমান চরকা আন্দোলনে মুসলমানই শীর্ষস্থান অধিকার করিয় বসিয়াছে। মুসলমান কাটুনীর তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের এন্ডি ও মুগা সুতার চাষ একরূপ ষোলআনাই মুসলমানদের হাতে।"[১৮৮]

মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা

---

[১৮৬] *Sufia Ahmed,Ibid, p.130*

[১৮৭] *Sufia Ahmed,Ibid, p.130*

[১৮৮] *দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত,মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ২৮,২৯*

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসনাধীনে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা করে মুসলমানদের চোখের সামনেই দ্রুত এগিয়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৯৯৩) অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, তবে তারা যাঁরা জমিদারী প্রাপ্ত হন তাদের, অধিকাংশ হিন্দু হওয়াতে সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানদের হাতে যে ক'টা জমিদারী ছিল, তাও হাতছাড়া হয় এবং দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তা হিন্দুদের হস্তগত হয়।[১৮৯]

মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার অভাবে চাকুরী ও সরকারী সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদতায় পড়ে রইলো, মুসলমানরা অনেক বিলম্বে বুঝতে পেরে সামনের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগলো। সরকারী চাকুরীর প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা সমূহে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত দানের জন্য ১৮৮২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কাছে Central National Muhamedan Asociation এক স্মারকলিপি প্রদান করে। ১৮৮৫ সালর ১৫ই জুলাই ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের নিয়োগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে এক প্রস্তাব ইস্যু করেন। ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের সঙ্গে এই মর্মে একমত পোষণ করেন যে, কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় মুসলমানদের প্রতি কোন ধরনের বিশেষ পক্ষপাত দেখানো সম্ভব নয়।[১৯০]

Muslim Community গ্রন্থ অধ্যায়নে জানা যায়, সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের স্বল্পতার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাদপদ অবস্থান। দ্বিতীয়, উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্মকর্তারা তাদের নিজ ধর্মের লোকদের প্রাধান্য দিত বলে মুসলমানরা অবাদ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় মুসলমানরা যতটা নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত, তা জনসংখ্যায় তাদের অনুপাতের বিপরীত দেখা গেছে যে জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও চাকুরীতে নিয়োগের সময় তারা এক ষষ্ঠাংশও পায় না। সে সময়ের জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের ২৭৪১ টি পদ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্ত কথিত তখন তারা ৬৪৭ টি পদে ছিল। উপরন্ত, এই অবস্থানেও জেলায় প্রভেদ ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহে এই হার

---

[১৮৯] *Sirajul Islam: The Permanent Settlement In Bengal A Study Of Its Operation 1790-1819, Published By- Bangla Academy, Dacca, First Edition- May, 1979, P: 128-141*

[১৯০] *Resolution of the Government of India, 15 July 1885, Para.22, op.cit, Quoted, Sufia Ahmed, Ibid, p.134*

Dhaka University Institutional Repository

ছিল নিম্নতম। বগুড়া জেলায় মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫:১; কিন্তু মুসলমানরা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পদে নিযুক্তি পেয়েছিল। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জেলায় মুসলমানরা এক-পঞ্চমাংশের কম পদে আসীন, অথচ এই জেলাদ্বয়ে মুসলমানরা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।[১৯১]

১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি বাংলা সরকার বিভিন্ন সরকারি বিভাগে একটি সার্কুলার প্রেরণ করে। বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ দেওয়া হয় ধ ভধরৎ ভরবষফ ধহফ হড় ভধাড়ঁৎ- এর নীতি অনুসরণ করেও মুসলমানরা তাদের নিয়ন্ত্রাধীন বিভাগে কতজন কাজ করছে তা রিপোর্ট করার জন্যে। যেখানে মুসলমানরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পূর্ণ অংশ পায়নি সেখানে কাজের বা সেবার দক্ষতার মান না কমিয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে বিষয়েও কর্মকর্তাদের সুপারিশ চাওয়া হয়।[১৯২]

সরকারি চাকুরিতে নিযুক্তি সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। ঢাকা মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলবী আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দিক নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন:

"The only practicable measure that may be adopted to secure the Mahomedans thair fair share of employment seems to me to reserve a fairly proportionate number of appointments for Mahomedans, without wish, there is very little hope of improving their deplorable conditions."[১৯৩]

---

[১৯১] *Govt of Eastern Bengal and Assan to Commissioner of Division, 25 May 1906, Para 2, Eastern Bengal and Assan Appointment Department Proccedings, May 1906, Quoted, Sufia Ahmed, Ibid, p.142*

[১৯২] *Circular No.8, 27 January, 1886, Para 4, Bengla Education Proceeding, February 1886, Quoted, Sufia Ahmed, Ibid, p:135*

[১৯৩] *Mouluvi Abdul Khair muhammad Siddiq, Superintendent, Dacca, 8 February, Bengla Education Proceedings. October 1886, Quoted, Sufia Ahmed, Ibid, p.139*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সরকার অবশ্য উপস্থাপিত সুপারিশের মধ্যে মাত্র কয়েকটা গ্রহণ করে। যে সকল দপ্তরে একজন মুসলমান কর্মচারীও নেই নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে সেখানে যোগ্য মুসলমান প্রার্থী নিতে হবে এবং নিয়োগ দানের পর তার প্রতি ভাল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।[১৯৪]

সরকার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয় যে, কাজের দক্ষতা রক্ষার পাশাপাশি যেন মুসলমানরা কাজে ন্যায্য অংশ পায়, যাতে "So as to prevent the depression of a numererus and influential class, and secure theire co-operation for the general benefit of the administration."[১৯৫]

ব্যাংকিং, সমবায় ও গ্রামীণ ঋণ

বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায় না। বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালী বিনিয়োগকারী পরিচালিত ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক।[১৯৬]

বৃটিশ আমলের ইউরোপীয় ব্যাংকগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: বানিজ্যিক ঋণ সরবরাহের জন্য কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ইউরোপীয় ব্যাংক, আধা-সরকারী ব্যাংক অব বেঙ্গল ও সরকারী সেভিংস ব্যাংক।[১৯৭] ১৮০৬ সালে ব্যাংক অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর (১৮০৭-১৮১৩) নিকট থেকে চার্টার পেয়ে ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে ব্যাংক কাজ শুরু করে। এর মধ্যে দশ লক্ষ টাকার শেয়ার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর।[১৯৮] সরকার সরকারি ট্রেজারি ও পাবলিক ডেট অফিসের পরিচালনার ভার ব্যাংক অব বেঙ্গলের উপর ন্যস্ত করে। ব্যাংক তদস্থলে শাখা খোলা আরম্ভ করে।[১৯৯]

---

[১৯৪] *Sufia Ahmed,Ibid, p.139)*

[১৯৫] *Sufia Ahmed,Ibid, p.139, 140*

[196] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫*

[১৯৭] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫*

[১৯৮] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৬*

[১৯৯] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত,পৃ: ৮৬*

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বাঙালী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে বেশ কিছু বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো লোন অফিস।এ ব্যাংকের শেয়ার মালিক ও ডাইরেক্টর ছিল বাঙালি। দেশের বিবিন্ন শহরে এই ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। এ ব্যাংক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ঋণ দিত।[২০০] ১৯০৪ সাল থেকে সমবায় আইনের অধীনে সমবায় ব্যাংক গড়ে উঠে। সমবায় ব্যাংকের শাখা প্রায় সকল মফস্বল শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলি নিয়ন্ত্রণ করতো। এ ব্যাংক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ঋণ দিত।[২০১] ১৯০৪ সাল থেকে সমবায় আইনের অধীনে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের মনের চাহিদা মেটাতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বাংলার কৃষকেরা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিত।[২০২]

ঋণের ধরণ অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারিত হতো। সমস্ত রকম গ্রামীণ ঋণকে চারভাগে ভাগ করা যায়। (ক) স্বল্প মেয়াদী ছোট বানিজ্য, কৃষি ও ব্যক্তিগত, (খ) স্বল্প মেয়াদী ছোট বন্ধকী বড় ঋণ, (গ) দীর্ঘ মেয়াদী অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী বড় ঋণ ও (ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী বড় ঋণ। গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা কৃষকদের যে ধার দিত তার সুদ ছিল প্রতি মাসে প্রতি টাকায় এক আনা অর্থাৎ বার্সিক শতকরা ৭৫ টাকা। কোন কোন স্থানে সুদের হার বেড়ে দাঁড়াতো শতকরা ১০০ টাকা। স্বল্প মেয়াদী গহনা বাসনপত্র বন্ধকী ঋণের সুদের হার হতো ১২.১৮ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণের সুদ ছিল শতকরা ১৮.২৪ টাকা। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণের সুদ ছিল শতকরা ১২.১৮ টাকা। সুদের এসব হার বাংলার সর্বত্র একই ছিল না। বিভিন্ন জেলায় ঋণের পরিমাণ ও চাহিদার উপর সুদের হারের হেরফের হতো।[২০৩]

---

[২০০] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী,প্রাগুক্ত,পৃ: ৮৭*

[২০১] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী,প্রাগুক্ত,পৃ: ৮৭*

[২০২] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, প্রাগুক্ত,পৃ: ৮৮*

[২০৩] *ড. এম. ওয়াজেদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮*

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলার মুসলিম শাসনের সূচনা হয় । তার পূর্বে অষ্টম শতকে উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রথম ইসলামের আবর্ভাব ঘটে এবং তারপর থেকে আরব বনিক ও ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রচার চলতে থাকে । ক্রমে বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি হয় । বাংলার মুসলমানরা প্রধানত শিয়া ও সুন্নী এই দুই ভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশের প্রথমাবধি আরব বণিক ও পীর দরবেশ কর্তৃক ধর্ম প্রচারিত এবং তুর্কি-আফগান শাসকগন কর্তৃক দেশমাসিত হওয়ায় সুন্নি মতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । মোঘল বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে ভারতবর্ষে প্রথম শিয়াদের প্রভাব পড়ে। তিনি পারস্য সম্রাটের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন । সতের শতেকে ঢাকার শাসনকর্তা মুকরম খানের (১৬২৬-২৭) সময় বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ঘটে। তিনি ঘটা করে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে 'বেরা ভাসান উৎসব' পালন করেন । মহরম উৎসবের প্রচলন ও ঐসময় থেকে আরম্ভ হয় ।[২০৪] তবে তুলনামুলক ভাবে সুন্নীদের সংখ্যা শীয়াদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল । ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে মূল বাংলায় সুন্নীদের সংখ্যা যেখানে ১,৭৫,৩৪,৭১২ জন ,সেখানে শিয়াদের সংখ্যা ছিল ১,৯২,১৩৯ জন ।[২০৫] সুন্নীদের মধ্যে শরীয়তপন্থী এবং মারফতপন্থী এ দুই ধারায় বিভক্ত ছিল । শরীয়তপন্থী গণ নির্ভেজাল কোরআন ও হাদীসের নির্দেশনার উপর থাকতে চেয়েছেন । আর মারফতপন্থীরা সুফীতাত্ত্বিক মরমিয়া ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিল। মারফতপন্থীরা বা সূফীবাদীরা বিভিন্ন তরিকায় বিভক্ত ছিল ।

এগুলির মধ্যে চিশতিয়া , নকসবন্দিয়া, কাদেরিয়া , সোহরাওয়ার্দীয়া, মাদারিয়া , পাচপীরিয়া প্রভৃতি প্রধান । বাংলাদেশেও এসব মতবাদের অনুসারীরা আছেন । বাংলাদেশকে 'পীর আউলিয়া' - এর দেশ বলা হয়। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা , বরিশাল , খুলনা, রাজশাহী , বগুড়া, রংপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী , চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন পীরের নামে অসংখ্য মাজার, আস্তানা ,

[২০৪] *ওয়াকিল আহমদ, উনিশশতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, পৃঃ ৪৩৭*

[২০৫] *ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৭*

Dhaka University Institutional Repository

খাসকাহ , দরগাহ, ও মকবরা আছে। পীরের মাজার দর্শন , কবর পূজা, মানত মানা , বাতি দেওয়া ইত্যাদি আচার ভক্তরা পালন করে । কোথাও কোথাও সামা - হলকা (নাচ-গান) ,জিকির, সাকি - ইশক প্রভৃতির রেওয়াজ আছে । শরীয়তপন্থীরা এগুলিকে অনৈসলামিক আচার বলে মনে করেন । এসব নিয়ে উভয় শ্রেনীর মধ্যে দ্বন্দ সংঘাত বাধে। সুন্নি মজহাব বা সম্প্রদায়ের 'হানাফি' ও 'মহম্মদী ' নামে দুটি মুখ্য বিভাগ আছে । হানাফীরা চার ইমামের নির্দেশাবলী অনুসরন করেন- তারা হলেন হানাফী , শাফী, মালেকি ও হাম্বলী । ইমাম বা ধর্মীয় ব্যবস্থাকার হিসাবে তারা ইসলাম ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন । তাদের নির্দেশাবলী 'ফিকাহ', 'তাফসির' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে চার জনের যে কোন একজনকে অনুসরন করে হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায় , কারন তাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মৌলিক কোন পার্থক্য ছিলনা । মহম্মদীরা কোরআন ও হাদিসের নির্দেশকে সর্বস্ব জ্ঞান করে । কোরআন আল্লাহর বানী , হাদিস হযরত মহম্মদের উপদেশ সম্বলিত বানী । কোরআন ও হাদি কে একান্তভাবে অনুসরন করার পক্ষপাতি বলে তাদের অপর নাম 'আহলে হাদিস' । সুফি মতের সাথে হানাফি মতের তেমন বিরোধ নেই । পীরভক্তরা নিজেদের হানাফি বলেই পরিচয় দেন , কিন্তু আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের সাথে হানাফি সম্প্রদায়ের যথেষ্ঠ মত-বিরোধ আছে । দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩-৬৩) মাধ্যমে ওয়াহাবি আদর্শে ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আব্দুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩) এবং তৎশিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৪০)এবং তৎপুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-৬০)এই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ফারায়েজি আন্দোলন ' করেছিলেন । 'ফারায়েজি আন্দোলন ' মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও ধর্মপ্রভাব মুক্ত ছিলনা । এটি শেষ পর্যন্ত ধর্ম , অর্থনীতি, রাজনীতি এই ত্রিমুখী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।[২০৬]

[২০৬] *ওয়াকিল আহমদ, উনিশশতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, পৃঃ ৪৩৮-৪৩৯*

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও রাজা রামমোহন রায়

উনিশ শতকের গোড়ার দিকটাই ছিল হিন্দু ধর্ম সংস্কার ও পুররুজ্জীবনের সময়কাল । এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ আচার আচরনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাবধারার সাথে খাপ-খাওয়ানো । এই আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অধ্যাপক সমরকুমার মল্লিক যথার্থই বলেছেন "রাম মোহন ও বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের কু প্রথা ও কু সংস্কার গুলির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলা হয়। "[২০৭] রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খৃীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা রাম কান্ত রায় মোঘল কর্মচারী ছিলেন । নিজ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করে পাটনায় গিয়ে আরবী , ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেন। পাটনায় তিনি সুফী মতে প্রভাবিত হন । আবার কিছুকাল তিব্বতে থেকে বৌদ্ধ ধর্ম সমন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মে থেকেই ধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মকে আদি একেশ্বরবাদে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । সেই লক্ষ্যে তিনি ১৮০৩ সালে 'তুহফাত-উল-মুয়াহিদীন ' (একেশ্বরবাদ সৌরভ) নামে আরবী ও ফারসী ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে রাম মোহন ধর্মে পৌত্তলিকতা ও নানবিধ কু সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং একশ্বরবাদের ভিত্তি করে একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন । প্রায় একই সময় হয তার 'মানজিরাতুল আধিয়ান ' (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা) । তুহফাতের মতো

[২০৭] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক,: আধুনিক ভারতের রূপান্তর (রাজ থেকে স্বরাজ), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪, কলেজ রোড, কলিকাতা, পৃঃ ১৬৬)*

Dhaka University Institutional Repository

তাও ছিল একেশ্বরবাদ প্রচারে নিবেদিত।[২০৮] রামমোহন তার মতবাদ প্রচারের জন্য ১৮২১ সনে "সংবাদ কৌমুদী " নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । উপনিষদের পৌত্তলিকতা শূন্য একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য রামমোহন বেদান্ত সুত্রের অনুবাদ করেন (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) । ১৮১৬ সাল থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলায় উপনিষদের ঈশ, কেন, কঠ, মুশুক প্রভৃতি খন্ড প্রকাশ করেন । এগুলো প্রকাশের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে রামমোহন বলেন " পৌত্তলিকতা আমাকে ধ্বংস করে, ধ্বংস করে সমাজের রন্ধ্র। মিথ্যা ও ভুলের তন্দ্রা থেকে দেশবাসীকে ঐক্য প্রচারই আমার উদ্দেশ্য "[২০৯]

ঐ সময় খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রভাবে অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল পৌত্তিলিকতার বিরূদ্ধে প্রচারণা চালানোর কারণে রক্ষণশীল গোড়া হিন্দুদের পক্ষ থেকে রামমোহন তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হলেন । অন্যদিকে যিশুর অলৌকিকত্ব চ্যালেঞ্জ করায় খ্রিষ্টান মিশনারীদেরও তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হন। তার মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ১৮১৫ সনে " আত্বীয় সভা ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন । সে যুগের কলকাতার প্রভাবশালী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক ভদ্রলোক ছিলেন আত্বীয় সভার সদস্য । আত্বীয় সভার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যারা ছিলেন বিশেষভাবে নিবেদিত তারা হলেন - দ্বারকানাথ ঠাকুর , প্রসন্ন কুমার ঠাকুর , (ঠাকুর পরিবারের বড় শালা) , টাকীর জমিদার কালীনাথ , ভূকৈলাসের রাজা কালী শঙ্কর ঘোষাল , নন্দকিশোর বোস, নীল রতন হালদার , তেলিনি পাড়ার জমিদার আনন্দ প্রসাদ ব্যানার্জী , রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ ।[২১০]

১৮৩০ সনে রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব উপাসনালয় স্থাপন করে স্বতন্ত্র রীতিতে উপাসনা শুরু করেন । এ উপসানলয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল , তাতে মূর্তি রাখা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাতে প্রয়াস ছিল নানা ধর্ম ও মতের মধ্যে মিল স্থাপনের । গোড়া হিন্দুরা এ নতুন মতাদর্শকে প্রতিহত করতে ১৮৩০ সনে 'ধর্ম সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ।

রাজা রামমোহনের (১৮৩৩) মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব দেন । বেদের অভ্রান্ততা ও একশ্বরবাদের উপর জোর দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে ক্রমশ: এক চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক চরিত্র দান করেন । একদল তরুন ব্রাহ্ম বাল্য বিবাহ ,বহু বিবাহ, কুলীন প্রথা প্রভৃতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে এবং বিধবা বিবাহ ও নারীমুক্তির পক্ষে

---

[২০৮] *ড. মো: আব্দুর রহিম ও অন্যান্য , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৪*

[২০৯] *ড. মো: আব্দুর রহিম ও অন্যান্য , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫*

[২১০] *ড. মো: আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৪*

Dhaka University Institutional Repository

জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলে ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন প্রান সঞ্চার করেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের পর কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখে। বার বার ভাঙনের ফলে সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও হিন্দুধর্মের প্রতিশ্রদ্ধা এবং অন্যদিকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের ফলে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ঠ কমিয়ে দিয়েছিল । অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাসের ভাষায় - "The story of Brahmoism in its last phase is the story of its progressive absorption within the older religion from which it had sprang."[২১১]

পৌত্তলিকতা সমন্ধে বিবেকানন্দের বক্তব্য তুলে ধরে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন-বেদান্ত ব্যাখ্যার হিন্দুদের যে সকল ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি কুসংস্কার বলিয়া । অন্যান্য ধর্মালম্বীরা নিন্দা করে বিকোনন্দ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রতিমাপূজা-তথাকথিত পৌত্তলিকতা-প্রথমাবস্থায় প্রয়োজনীয়,পরে কিঞ্চিত উন্নতি লাভ করিলে ইহা ত্যাগ করিলে চলে। বাংলায় হিন্দু নব জাগরণের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৪০-১৯২৩)। তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে হিন্দু ধর্মের মূর্তিপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। হিন্দু নবজাগরণের আর একজন পুরোহিত হলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)। হিন্দু নবজাগরণের সম্ভবত সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক হলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)।[২১২]

খ্রীষ্ট-ধর্ম

খ্রীষ্ট ধর্ম একটি প্রচারশীল ধর্ম। মিশনারীগণের মাধ্যমে এ ধর্মের প্রচার একটি বিশিষ্ট রীতি। নানা রকম কৌশল গ্রহণ করে তারা ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করে থাকে।

বাংলায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের শুরু সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন-

[২১১] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৯-১৭০১*

[২১২] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক , আধুনিক ভারতের রূপান্তর , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১-১৮৩*

Dhaka University Institutional Repository

"ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজগণ বাংলায় ব্যবসা বানিজ্য উপলক্ষে বসবাস করতে আরম্ভ করিলে বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক খ্রীঢধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, ব্যাণ্ডেল ও হুগলীতে পর্তুগীজরা বানিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমে এইসমুদয় স্থানে, বিশেষতঃ হুগরীতেবহু পর্তুগীজ ও ইউরেশিয়ান স্থায়ীভাবে বাস করে। পর্তুগীজেরা জোর করিয়া হিন্দু-মুসলমানদের খ্রীষ্টান করিত, এবং গর্ব করিত যে, সমস্ত প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে পাদ্রীরা দশ বৎসরে যত ভারতীয়কে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে হুগলীতে এক বৎসরে তাহার চেয়ে বেশী লোক খ্রীষ্টান হয়। পূর্ববঙ্গের অনেক লোক পর্তুগীজদের প্ররোচণায় খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মোট সংখ্যা বেশী নহে।"[২১৩] তাঁরা শহর-গ্রাম- গঞ্জে মিশন খুলে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে ধর্ম প্রচার করতেন। মিশনের সাথে থাকত দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি। তাঁরা স্থানীয় ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র- পত্রিকা মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এগুলিতে খ্রীষ্ট ধর্মের মহিমা ও পরধর্মের নিন্দার কথা থাকত। তাছাড়া হাট- বাজার, জনবহুল স্থানে তাঁরা গিয়েও খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। মিশন তহবিল থেকে দীন-দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থ করতেন। মানুষ সহজে তাঁদের শিকারে পরিণত হত।[২১৪] বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীর গবেষণা থেকে জানা যায়, ঊনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার মফস্বল এলাকায় বিশেষত ঃ নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের বই পত্রে ইসলাম, মসুলিম ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অপ্রপচার চালায়। খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সে সময় সবচেয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন যশোরে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)।[২১৫] বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তকের মাধ্যমে পাদ্রীদের সাথে তাঁর তুমুল সংগ্রাম পরিচালিত হয়। এই সংগ্রামে অনেকেই তাঁর হাতে পরাজিত হন। তন্মধ্যে একজন বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক পাদ্রী শেখ জমিরুদ্দীন পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মুনশীর প্রেরণায় তাঁর সহযোগী হিসেবে ইসলাম প্রচারে আত্ন

---

[২১৩] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ১৩০ পৃঃ*

[২১৪] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৯-৪৪০*

[২১৫] *মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী ঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান ঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা - একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, জুন ২০০৭, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)*

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ করেন।[২১৬] এতদুদ্দেশ্য তিনি নিম্নোক্ত কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেন ১.ওয়াজ-নসিহত, ২.লেখালেখী, ৩.পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার, ৪.বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ৫.শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ৬.আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগনকে আত্মসচেতন করে তোলা।[২১৭] ১৯১৩ সনে কোম্পানীকে দেয়া সনদে মিশনারীদের এদেশ বসবাস এবং ধর্ম প্রচারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টান ধর্ম ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, এ বিষয়ে উদার মতালম্বী রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ

"গত বিশ বৎসর যাবত একদল ইংরেজ মিশনারী প্রকাশ্যে নানাভাবে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে খ্রষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, প্রথমত ছোট বড় নানা গ্রন্থে এই উভয় ধর্মের নিন্দা ও কুৎসা এবং হিন্দুদের দেবতা ও মহাপুরুষদের প্রতি গালাগালি ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা; দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় লোকের গৃহের সম্মুখে রাস্তায় দাড়াইয়া স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য ধর্মের হীনতা প্রচার করা; তৃতীয়তঃ নিম্ন শ্রেণীর কোন লোক অর্থলোভে বা অন্য কোন স্বার্থের আশায় খ্রীষ্টান হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণ ও চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া অপরকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহদান।"[২১৮]

এ প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন,

"চাকুরী, শিক্ষা, অর্থের লোভ দেখিয়ে তারা কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করতে সফর হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরূদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্বোধিত করা অংশগত মিমনারীদের চিন্তাধারার ফল। শুধু নিম্ন বর্ণের নয়, উচ্চ বর্ণের সন্তানেরা খ্রীষ্ট ধর্মে আকৃষ্ট হন। মহেষ চন্দ্র ঘোষ, (১৩৩২) গোপীনাথ নন্দী(ঐ), লালবিহারী দে (১৮৪৩),জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৫১) খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সালে মধ্যে দশজন হিন্দু কলেজের ছাত্র দীক্ষা নেন। মধুসুদোন দত্ত হিন্দু কলেজে পড়ার সময় খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেন(১৮৪৩)।"[২১৯] সুতরাং দেখা যায় যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা সরকারী সুযোগকে কাজে

---

[২১৬] *আলো আরজুমান বানু ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ঃ তার ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০২, ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃঃ ৪৩*

[২১৭] *মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১*

[২১৮] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ১৩২ পৃঃ*

[২১৯] *ওয়াকিল আহমদ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪০*

Dhaka University Institutional Repository

লাগিয়ে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে ও প্রলোভনে ফেলে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিল। তবে এ দীক্ষা লাভ খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তির কারণে ছিলনা। অনেকাংশেই নবদীক্ষিতরা ছলবল ও কৌশলের স্বীকার হয়েছিল। যেমনটি দেখা যায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই 'সমাচার চন্দ্রিকা' সংবাদপত্রে বালকদেরকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে বল প্রয়োগ ঘটানোর সংবাদ প্রচারিত হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কারণ হিসেবে আরও একটি বিষয়কে উল্লেখ করে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখছেন- "খ্রীষ্টিয় মিশনারী অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্য বাংলায় খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব বিস্তারে বেশী সহায়তা করিয়াছে। ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অপেক্ষা শেক্সপীয়র (shakespeare), মিল্টন, পোপ, টেনিসন, অ্যাডিসন প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যিকগণের রচনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীরা খ্রীষ্টিয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কারের সাহিত্য অধিকতর ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াছে।[২২০]

ওয়াকিল আহমদের উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম দিকে মিশনারীদের প্রশ্রয় না দিলেও ১৯১৩ সালের সনদ লাভের সময় তাদের ধর্ম প্রচারে পূর্ণ স্বাধনীতা দেওয়া হয় এবং ১৮৫০ সালের ২১তম বিধির আলোকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেনা মর্মোাইন করে মিশনারীদের সহায়তা করেন।

বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের উদযাপিত কয়েকটি প্রধান রীতি ও উৎসবাদি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১.গুড ফ্রাইডে (Good Friday) : এটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ধৈর্য ও মৃত্যুকে স্মরণ করে পালন করা হয়। এ দিনে উপবাস করা, যীশুর মৃত্যুকালের হিতোপদেশ পাঠ এবং যীশুর শেষ যন্ত্রণা ভোগের সময়ের সাথে একত্মতা প্রকাশ করা হয়। এ দিনের ঘটনাবলীকে মানুষের মুক্তি লাভের উৎস হিসাবে বিশ্বাস করা হয় বিধায় একে, ভালো (গুড) বলা হয়।

২. ইস্টার সানডে [এপ্রিল (Easter Sunday)] : এটি খ্রিস্টানদের নিকট সবচেয়ে আনন্দঘন দিন। এ দিনে যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভ এবং ঈশ্বরের ভালবাসা ও ক্ষমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে স্মরণ করা হয়। খ্রিস্টানরা পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্র দিয়ে এ দিন অত্যান্ত আনন্দের সাথে উদযাপন করে।

---

[২২০] *রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ১৩৪ পৃঃ*

Dhaka University Institutional Repository

৩. ক্রিস্টমাস [ডিসেম্বর ২৫ (Christmas)]: এটি খ্রিস্টানদের পঞ্জিকার সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় উৎসব। যীশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব। আনন্দঘন এ দিবস পরস্পর উপহার আদান-প্রদান, বিভিন্ন পরিবারে বেড়ানো ও শুভকামনা করা এবং বিশেষ পারিবারিক ভোজের আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ক্রিস্টমাস কার্ড বিলি এ দিনের জনপ্রিয় ঘটনা। এদিন যীশু খ্রিস্টের জন্মের দৃশ্যকে স্মরণ করে মধ্যযুগে ইউরোপে পালনকৃত রীতি ক্রিস্টমাস ট্রি সাজানো এবং সান্তাক্লজ বাংলাদেশেও পালিত হয়।[২২১]

ইসলাম ধর্ম

সে সময়ে মুসলমানগণ অনেকাংশে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তাদের আকীদা বিশ্বাস ও প্রাত্যহিক আচার আচরণে অনৈসলামিক ভাবধারা ও হিন্দুয়ানী নিয়মনীতি ব্যাপক ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপক অধঃপতন দেখা দেয়। এ সমস্ত অনৈসলামিক বিশ্বাস ও কৃষ্টি তথা নানাবিধ কুসংস্কার থেকে ইসলাম ও মুসলমানরেকে রক্ষার জন্য বেশ কিছু শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ওয়াহাবী ও ফরায়েজী অন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। মুসলমানদের আচরিত কতগুলি ইসলাম নিষিদ্ধ বিশ্বাস ও কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন সাময়িক পত্রে। ১২৯৯ সন আষাঢ় সংখ্যায় 'ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়:

"হজরত মাওলানা কেরামত আলী মরহুম মগফুরের আগমনের পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান পৌত্তলিকতাযুক্ত কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।"

মুসলমানগণ নমাজ রোজ প্রভৃতি ধর্মকর্ম ছাড়িয়া দিয়া, হিন্দু দেববৌর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়ছিল। মনসা পূজা, শীতলা পূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্যপীরের পূজা, কালীর নামে পাঠা উৎসর্গ এ সমস্ত কার্য্য মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীর পূজা, দরগা পূজা, দরগাঘরে নানাবিধ বেদাতি কাজ, মহরমের সময় তাজিয়া, জারীগান, গাজীর

[২২১] কে.এম. মহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পূর্বোক্ত, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ:নং:২৮৯,২৯০*

Dhaka University Institutional Repository

গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্ম বির্গহিত কাজের অনুষ্ঠান হত। বিবাহ, খানা ও স্ত্রীলোকের রজস্বলা উপলক্ষ্যে জগন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হত। ১৮৯৭ সালের মার্চ সংখ্যায় 'হাফেজ' পত্রিকায় 'সেরেক ও বেদাত' প্রবন্ধে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। "আমাদের এই হিন্দুস্তানবাসী মুসলমান নামধারী ভ্রাতাগণের মধ্যে যে কত শত নূতন মনগড়া কার্য্য প্রচলিত রহিয়ছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায়না, ... খৎনার সময় অমোদ অহরাদ, লোকজন খাওয়ান, ... তাজিয়া বাহির করা, মহরমের মজলেস করা, অলম করা, মেহেদী বানান, মৃত্যুর চতুর্থ (চাহারাম), দশম (দশা), ৪০ দিন, ছয় মাস বা এক বৎসরে মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য কোন প্রচার কার্য্য করা, কবর চাদার দ্বারা ঢাকা, ... সন্ধ্যার সময়ে কবরে চেরাগ দেওয়া, ...বিধবার পুনর্বিবাহ না দেওয়াকে আয়েব জানা প্রভৃতি এরূপ কার্য্য আছে, যাহা কোরান ও হাদীস শরীফে নাই। ...যাহা হউক, যখন ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত, তখন আমাদের উচিত, পয়গম্বর সাহেবকে বিচারক নিযুক্ত করা।"[২২২]

মুসলমানগণ ইসলামের নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ থেকে বহূদূর সরে গিয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, তাদেরকে নির্দ্ধিধায় হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা ও স্তুতি কীর্ত্তন গাইতে দেখা যায়। বাংলার নবাব বাদশাহ এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং কবি সাহিত্যিকগণ এসব রচনা করে গেছেন । মুছলিম জনসাধারণ বিশেষ করে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এরূপ এক কলুষিত ইছলাম বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত এ সমস্ত নও-মুছলমানদের পক্ষে ইছলামের সত্যিকার শিক্ষা ও আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার কোন উপায় ছিলনা। সুতরাং কোন সময়ে সরাসরিভাবে এবং কোন সময়ে আরবী- ফার্সী নামের অবরণে তারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী এবং কুসংস্কারসমূহকেই তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পায় এবং এই সবই পুনরায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তদুপরি বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে নবাব-বাদশাহগণ যে সমস্ত মারাত্মক মত-বিশ্বাস প্রচার করেন, তা অন্যান্য মুছলমানের মনকেও দ্বিধাহীনভাবে পুরাতন হিন্দু প্রতিমা পূজা, ক্ষতিকর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। সৈয়দ জাফর শাহ বিরচিত কালীস্তোত্রের কথা অনেকেই জানেন। মুছলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করলে কালা ও গঙ্গার স্তোত্র শ্রীকৃষ্ণের

[২২২] *ইসলাম প্রচারক, আষাঢ় ১২৯৯, উদ্বৃত, ওয়াকিল আহমদ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮*

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমলীলা বিষয়ক গীত রচনা করেছেন এরূপ বহু সৈয়দ মীর্জা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ আমরা পাব। আকরম খা বলেন ,

"জেবুল মূলক শামারুখ 'কাব্যে দেখা যায় যে, মুছলিম কবি হিন্দু-দেবীগণকে মুছলমানের পীররূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।"[২২৩]

মুসলিম কবিরা তাদের কবিতার শুরুতে হিন্দু দেব দেবীদের বন্দনা গাইতে দেখা যায় মোহাম্মদ ইউনুছ রচিত 'চৌধুরীর লড়াই'শীর্ষক বন্দনায় গদ্যরূপ-

মক্কার পূর্বে ঠাকুর জগন্নাথকে বন্দনা করি।
যেখানে প্রভেদ নাই জাতি ধর্মের

....

(মক্কার) পূর্বে আমি পুণ্যধাম কাশীকে বন্দনা করি
যেখানে প্রতি ঘরে হরিনাথ কীর্তন হয়
প্রতি ঘরের দুয়ারে যেখানে তুলসী-তরু রাখা হয়।

মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এমন পচন ধরেছিল যে, মুসলমানদের সামাজিক কাজকর্মের অনেকাংশ জুরে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কার স্থান করে নিয়েছিল। মুসলমানদের এই চূড়ান্ত অধঃপতনের চিত্র সুচিত্রিত করেছেন মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর লেখনীতে,"ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুন-পীর বদরে, গৌরীচন্দ্র চৈতন্র-গোরাচান্দ পরি, ওলাইচণ্ডী-ওলা বিবিতে, সত্যনারায়ণ-সত্যপীরে, লক্ষীদেবী-মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেব-দেবীগণ মুছলমানদের নিকট তাহাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধাও অব্যাহতভাবেই পাইতে থাকেন। তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর, বহু কল্পিত পীরের কবর এবং কোন কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত বহু কল্পিত পীরও মুছলমানদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, শিন্নি ও মোমবাতি লাভ করিতে থাকেন। অনেক স্থান, খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুছলমানদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ -আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহর স্থান দখল করিয়া থাকে এবং অংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থানই তাহারা দখর করিয়া আছে।

---

[২২৩] *মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০২পৃঃ ৯৫*

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের প্রচুর অভাব, অন্যদিকে নানারকম অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের অবস্থা এমনি শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, তারা জীন ভূতের ভয়ে অস্থির থাকত, আর যাদু টোনা, টোটকা ও ঝাঁড়ফোঁক নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকত। সেই সময় বাজারে প্রচলিত যাদু টোনার বইতে ভূ বাঁধার মন্ত্র ও ঝড় তুফান থেকে বঁচার মন্ত্র পাওয়া যায় নিম্নরূপ ঃ

-ভূত বন্ধন মন্ত্র-

কিছু সরিষার তৈল হাতে লইয়া নিচের মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করিয়া ঐ তৈল মুখে মাখিতে হইবে। তাহা হইলে কোন কার ভূত-প্রেত তাহার কাছে আসিতে পারিবেনা, নিঃসন্দেহে ভাগিয়া যাইব। মন্ত্রটি এই-

“মন্ত্র মন্ত্র মহামন্ত্র হরে মন্ত্র ছু,
ভাগ ভূত পালা ভূত, যারে ভূত ফুঁ।
মামদো ভূত সামদো ভূত সর্ব্ব ভূত ভাগ,
মহা অগ্নি মহা অগ্নি শীঘ্র করি হাগ।
সর্ব্ব ভূত বন্ধ করি মন্ত্ররের জোরে,
আমার কাছে নাহি আসিস কহি বারে বারে।
আল্লার ও নবীর দোহাই তোর তরে লাগে,
মোর নজর হতে ভাগরে ভূত
তোর বাপের আগে।
লাএলাহা ইল্লাল্লাহ ফুঁ।।”

‘ঝড় বন্ধন মন্ত্র’

হুঙ্কার মন্তর মহামন্তর ঝড় বন্ধন করি,
ঝড়ের সাথে দেও দৈত্য জিন আর পরী।
বন্ধন করিয়া ফেলি চারিকুলের জোরে,
নাহি লাগিস অমার ঘরে বলি বারে বারে।
দোহাই ধর্মের আল্লাহ নবীর কিরে,
আমার এই ঘরের দিকে নাহি তাকাস ফিরে।

Dhaka University Institutional Repository

ইল্লাহ ২ কুল কুল ফুঁ,
বন্ধন লাগে ফট,
বালা ভাগে চট,
লাএলাহা ইল্লাল্লাহু।
মালেকুল হক মাওলা।[২২৪]

মধ্যযুগীয় সুফিদের দরগাহ্ (খানকাহ) বা মাযারসমূহ অনুসারীদের পরিদর্শনের পবিত্র স্থানে উপনীত হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয় ব্যতিরেকে প্রতিদিন শত সহস্র ভক্তকুল মাযারসমূহ জিয়ারত করে মৃত পীরের আর্শীবাদ কামনা করেন। বায়েজিদ বোস্তামী ও শাহ আমানত শাহ্ দরগাসহ বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য দরগাহগুলি হলো: সিলেটের শাহ জালাল,শাহ পরাণ, রাজশাহীর মাহী সাওয়ার, ঢাকা মিরপুরের শাহ আলী বোগদাদী, খুলনার শাহ মাখদুম, রংপুরের কেরামত আলী জৌনপুরী, বাগেরহাটের খান জাহান আলী, ঢাকা হাইকোর্টের শরফুদ্দিন চিশইত ইত্যাদি। সুফিদের দরগাহ ও মাযারে নিম্নলিখিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১. পীর পর্শতি বা পীর পূজা: বাংলার জনপ্রিয় পীরের সমাধিসমূহে সচারাচর জাঁকজমকপূর্ণ ছাওনি দিয়ে বা কাঁদা মাটি দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সমাধির উপরে দামী চাদর বা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। প্রতি মুহূর্তে আতর গোলাপ জল এবং অন্যান্য নান প্রকারের তরল সুগন্ধি সমাধির উপরে ছিটানো হয়। লুবান (সুগন্ধি বাতি, মোমবাতি, মৃন্ময় প্রদীপ সমাধিস্থলে জ্বলতে থাকে। সমাধিতে চন্দন ও সিন্দুর রঞ্জক রূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল, রঙ্গিন মালা, মাটির অশ্ব এবং এ জাতীয় বহু জিনিস পীরের দরগাহে নিবেদন করা ঞয়। মুরিদ এভাবে মৃত পীরের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উৎসর্গ করে।

২. উরস: পীরের মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্মানে এটি করা হয়ে থাকে। উরস এর আক্ষরিক অর্থ হলো বিবাহ। তবে সুফিবাদে এটি পীরের মৃত্যু দিবসকে নির্দেশ করে এবং মনে করা হয় যে এর মধ্য দিয়ে পীর ওআল্লাহর মাঝে সম্মিলন ঘটল। এ দিনে দরগাহ চত্তরে সাধারণত মেলা বসে। দরগাহ্র গুরুত্ব অনুসারে এরূপ মেলা এক দিন, এক সপ্তাহ, এক

[২২৪] *এছলামী মন্ত্র, ৭১ পৃঃ, উদ্বৃত মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫ ও ২০৬*

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষকাল এমনকি একমাস পর্যন্ত চলে। উরসের দিনে ইসালে সওয়াব, মিলাদ-মাহফিল, কাওয়ালী বা সামার আসর বসে দরগাহ প্রাঙ্গণে।

৩. চেরাগী: এটি হলো মৃত পীরের সমাধিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত খাদেমের হাতে সমর্পিত মানত সিদ্দিমূলক প্রদীপ উপহার। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এ প্রদীপ (বাতি) যদি মৃত পীরের সমাধিকে বেশি আলোকিত করে তবে মানতকারীর প্রার্থণা গৃহীত হয়েছে।

৪. শিরনি: জীবিত বা মৃত পীরের সমাধিস্থলে পরিবেশিত অতি উপাদেয় খাবারকে বলা হয় শিরনি। এর মধ্যে মিষ্টি, কেক, ফল, অন্ন এবং ঝোলাগুড় ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। মনে করা হয় যে, এরূপে শিরনি বিতরণের মাধ্যমে খারাপ আছর, বিপদ, দুর্ভাগ্য ও উপস্থিত সমস্যাসমূহ দূর হয়ে যাবে।

৫. তবারক: এটি সাধঅরণত খাদ্যদ্রব্য, যা ইত:পূর্বে জীবিত বা মৃত পীরের নামে অর্পণ করা হয়েছে। উপস্থিত জনতা (গরিব লোক) একে পবিত্র দ্রব্য হিসাবে পীর ও আল্লাহর নামে গ্রহণ করে।[২২৫]

সূফী ও বাউল সাধকদের ব্যাপক প্রভাব বাংলার সর্বত্র বিরাজমান ছিল, যেমনটি অনেকাংশে এখনো দেখা যায়। সূফী ও বাউলদের প্রভাব সর্ম্পকে রানা রাজ্জাক আহসান লিখেন, ... "The Sufi saints had made significant and lasting impact upon the spiritual life of the rural Muslims, the Bauls (folk singers) hope blended mysticism of the æBhokti Movement" with that of the teaching of the Sufi Saint were popular in the country side."[২২৬]

[২২৫] *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পূর্বোক্ত, পৃ:নং:২৮৬, ২৮*

[২২৬] *Rana Razzaque Ahsan: Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947), Dept. of History, University of Dhaka, March 1997, some aspects. some aspects. P.9*

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির জীবনী শক্তি। কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে জাতির শিক্ষার উপর। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন কাল থেকে জ্ঞান চর্চার একটা ধারা চলে আসছিল এবং ভারতীয়দের উপর এর স্থায়ী এবং কার্যকর প্রভাব ছিল।[২২৭]

মুসলমান আমলে ভারতীয় মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল। তাহারা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গ-স্বরুপ মনে করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, বিদ্যা শিক্ষা করিলে আল্লাহর আরাধনা করা হয়। প্রত্যেক মসজিদ, ইমাম বারা, খানকাহ এবং আলেম ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শাসক, ওমরাহ্ ও রাজকর্মচারীগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিত লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ও মাদরাসা স্থাপন করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করা হত। মোঘল সাম্রাজ্যে শিক্ষার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলেছেন,

---

[২২৭] *Thomas ,f.w,the history and prospects of British Education india past . pp, 1-2* উদ্বৃত *Muslim community in bengal by Sufia Ahmed, p-6*

Dhaka University Institutional Repository

"যুবকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যালয় আছে। কিন্তু হিন্দুস্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।[২২৮] কিন্তু উনিশ শতকের শুরুতে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত সরকারের পক্ষে তদন্ত কার্য পরিচালনা করে দেশীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে যে তিনটি প্রতিবেদন পেশ করেন তা থেকে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পূর্ণ চিত্র লাভ করি। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষকদের বেতন খুব কম, তাঁরা অদক্ষ এবং শিক্ষার মান খুব নিচু।[২২৯]

আধুনিক শিক্ষার অভাবে ব্যপক বন্ধাতা ও জড়তা দেখা দিয়েছিল । আধুনিক জীবন ধারায় অনুপ্রবেশের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অব্যাহত চর্চা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় আবদ্ধ ছিল নিজ নিজ সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থর গতানুগতিক গন্ডিতে। মক্তব-মাদরাসা ও টোল-চতুষ্পঠীসমূহে শিক্ষা ছিল প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্র ভিত্তিক, সেখানে কূপমণ্ডুকতা ও মুখস্ত বিদ্যার অপ্রতিহত প্রাধান্যের দরুন শিল্প সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে পারেনি।[২৩০] উনিশ শতকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা চর্চা জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে এ শিক্ষা নিয়ে সংশয়,দ্বন্ধ ও মতবিরোধ দেখা দেয়। এর কারণ হিসেবে হান্টার লিখেছেন,

"মুসলিমগন জন্মগতভাবে, জাতি গতভাবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হতেও অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক কাঠামো চুর্ণ-বিচুর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইংরেজী স্কুল -কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল শিক্ষার প্রতি তারা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, যা ঐ মুহূর্তে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এ ব্যাপারে তারা সরকারে সামান্যতম সহানুভূতিও আকর্ষন করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজেও মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিল না।"[২৩১]

---

[২২৮] *এন এন ল প্রমোশন অব লার্নিং ইন ইন্ডিয়া, মুসলিম রুল, ১৬১, এম এ রহিম , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮*

[২২৯] *Sufia Ahmed, Ibid, p-6*

[২৩০] *সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (প্রথম খন্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৩ পৃঃ ৭৩*

[২৩১] *W.W. Hunter Ibid, PP 152-53.*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সমাজেও হিন্দু বর্ণ প্রথার আদলে অভিজাত ও নিচু শ্রেণী বলে সামাজিক ভেদাভেদ প্রকট ভাবে বিদ্যমান ছিল। অভিজাত বা উচু শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন থাকলেও অনভিজাত বা নিচু শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিলনা বললেই চলে। মুসলমান সমাজের লেখাপড়ার চিত্র তুলে ধরে ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন "মুসলমান সমাজে বিত্ত, বিদ্যা, ও কুলের দিক দিয়ে অশরাফ, আতরাফ শ্রেণীভেদ ছিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মত আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার রীতি ছিল, নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মত আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধে লেখপড়ার চর্চা ছিলনা। শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান বংশোদ্ভুত লোকেরা নিজেদের অভিজাত মনে করতেন। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজুর ছিল আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। দেশের এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারের ছেলেরা মক্তব মাদরাসায় লেখাপড়া করত বটে, সেটি ছিল ধর্ম শিক্ষা নির্ভর; বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞান চর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহন বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আশরাফ শ্রেণীর মধ্যে একটি অংশ যথা অলেম, পীর, দরবেশ, মৌলবী, মাওলানা কেবল আরবী-ফারসি শিক্ষয় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন, সমাজের পার্থিব ভালমন্দের কথা না ভেবে, মানুষের আধ্যাতিক উন্নতির দিকে তাঁরা অধিক নজর দিতেন। তাঁদের কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করা।[২৩২] এদেশীয়দের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ইংরেজদের আগ্রহ না থাকার পেছনে কারণ ছিল যে, তারা এটা চায়নি এদেশের মানুষ শিক্ষা অধিকার সচেতন হয়ে উঠুক এবং তারা প্রাধান্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়ে পড়ুক, এ ধরনের রাজনৈতিক কারণেও ইংরেজরা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা ও উদাসীনতা দেখিয়েছে। কারণ বাণিজ্য করে মুনাফা লাভ ও দেশের মানুষদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ বিষয়ে অন্তর্নিহিত সত্য উম্মুচন করে ইংল্যান্ডের ভারত সভার একজন ডিরেক্টর বলেছিলেন,'ইংল্যান্ড তাদের ভুলের জন্য আমেরিকা হারিয়েছিল। তাদের ভুল ছিলো, সেখানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারত প্রসঙ্গেও যেন সে ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'[২৩৩] বৃটিশ রাজনীতিবিদরা ভারত সরকারের পক্ষে তার প্রজাকে শিক্ষা দান করা নৈতিক

---

[২৩২] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪৭৩*

[২৩৩] *জন ক্লার্ক মার্সম্যান, জুন ১১,১৮৫৩ উদ্ধৃত আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দ্যা মুসলিমস ইন ব্যঙ্গল, পৃ:১৯১*

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব বলেছেন। ১৭৯২ খ্রীঃ চার্লস গ্র্যান্ট কোর্ট অব ডিরেক্টরের কাছে এক নিবন্ধননামা পেশ করেছিলেন।[২৩৪]

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীগণ বাংলাদেশে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হইয়াছিল। ১৭৩১ সালে সোসাইটি ফর দি গ্রমোশন অব দি খ্রীষ্টান নলেজ (Society for the promotion of the Christian knowledge) নামক ধর্ম প্রচারকদের একটি দল কলিকাতায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়ে বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৫৮ সালে সুইডেনের ধর্মপ্রচারক জাকারিয়া কিয়ারনান্ডার কলিকাতায় অন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশনারীগণ কয়েকটি প্রাথমিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাহাদের প্রধান ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়। মিশনারীগণ মনে করিত যে, ইংরেজী জ্ঞান লাভ করিলে হিন্দুগণ মূর্তি পূজার অসরতা বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা যাইবে।[২৩৫]

কলিকাতার মুসলমানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেসটিংস ভারতের প্রথম সরকারী কলেজ, কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি ফার্সি সাহিত্যের প্রতি তাঁর বাস্তব অনুরাগ প্রকাশ করলেন। এর মাধ্যমে এটাও স্বীকৃত হল যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সকলেই আশা করেছিল। তিনি বাংলার বিচালয়ে কাজ করার জন্য মুসলমান কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। এক দশক পরে জোনাথন ডানকানে হিন্দুশিক্ষার জন্য বেনারেসে একই ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আরও পরে এালফিনস্টোন করেছিলেন পুনায়। কিন্তু সদ্য ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় শাসকদের তুলনায় শিক্ষার এই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সামান্য। এর সুফল ও ভোগ করছিল খুবকম সংখ্যার ছাত্র। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এই দৃষ্টি ভঙ্গির বড় কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি।[২৩৬]

ধর্মনষ্ট, আত্মসম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়া এবং ইংরেজি ইত্যাদী কারণে মুসলমানেরা ইংরেজী থেকে দূরে সরে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন নতুনভাবে অনুভূত হলো ঠিক সে সময়ে উপমহাদেশে মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন জোড়দার হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে

---

[২৩৪] *সিলেক্ট কমিশন, এইচ সি.১৮৩১, পৃ:৩৮৯ উদ্ধৃত আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দ্যা মুসলিমস ইন ব্যঙ্গল, পৃ:১৮*

[২৩৫] *আর. সি. মজুমদার, বেঙ্গল ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী, উদ্ধৃত, এম এ রহিম , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১০৩,১০৪*

[২৩৬] *Sufia Ahmed, Ibid, p-6*

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও পূর্ববঙ্গে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ (১৮৮০-১৮৪৯) ও দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসন শোষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলেন। ইসলাম ধর্মে যেসব কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি আছে, যে সব দূর করে কোরান-হাদিসের আদর্শে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।তারা ক্রমে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন।[২৩৭]

গ্রামে মানুষের ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মীর মোশাররফ হোসেন আমার জীবনীতে লিখেছেন,"আত্মীয়-স্বজন গুরুজনদের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজি পড়লেই, একরূপ ছোট খাট শয়তান হয়।.... সরাব খায়।"[২৩৮] তাছাড়া ইয়াং বেঙ্গলদের ধর্মবিরোধী একরোখা হাবভাব সকলের কাছেই উদ্বেগজনক ছিল। ডাক্তার ডোমাস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানরা তাদের সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন, ইয়াং বেঙ্গলদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার কথা ভাবতেন না।[২৩৯]

এর উপরে আছে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য। ব্যয়বহুল ইংরেজি স্কুলে সন্তানদের পড়ান দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আধুনিক বিদ্যালয়গুলি ছিল শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ গ্রামে যাদের সামান্য সামর্থ্য ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারে নি। ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ১৮৫৪ সালের পরিকল্পনা (Education Dispatch, 1854) এর সুপারিশ মোতাবেক প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ গঠন, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুলে ব্যবস্থা, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরেজি এবং নিম্ন শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষা মাধ্রমরূপে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বলা হয়।[২৪০] কোম্পানীর আমলে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হলেও ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচ বা শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ছিল

---

[২৩৭] *ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৭৬)*

[২৩৮] *মীর মোশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, পৃ: ১৩৩*

[২৩৯] *(Dr Jumes wise-Notes on the Races, casts and Trades of Eastern Bengal, London, 1883, p-36- উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৭৮)*

[২৪০] *মল্লিক উদ্ধৃত এম. এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ:১০৮*

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই ভারতে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল।[২৪১]

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো রিপনের আমলে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন নিয়োগ। হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও নীতি শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির অবস্থার উন্নতির উপর জোর দেয়া হয় এবং আর্থিক সাহায্য দানের সুপারিশ করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নতির জন্য দরাজ হাতে সরকারী অর্থ অনুদানের প্রস্তাব করা হয়।[২৪২]

বাংলায় কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া জেলাশহরগুলিতে ও কলেজ গড়ে উঠেছিল, যা বোম্বে বা মাদ্রাজের বেলায় ঘটেনি। বহু কলেজের জন্য স্থানীয় জমিদারগণ জমিজমা, ভবন এবং কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু ব্যায়ের সিংহ ভাগই এসেছে ছাত্র বেতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৎসামান্য সরকারি অনুদান থেকে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন শিক্ষদের কাজ করতে হয়েছে স্বল্প বেতনে এবং পাঠ্যক্রমে ব্যায় বহুল বিজ্ঞান শিক্ষার স্থলে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলি।[২৪৩]

লর্ড কার্জন শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯০১ সালে সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলনের আহবান করেন। সেখানে প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষাকর্তা ও বিশিষ্ট কিছু শিক্ষাবিদ যোগদান করেন। সম্মেলনের ১৫০ টি গৃহিত সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম হিসাবে শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। ১৯০৪ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। এই শিক্ষানীতির সুফল হিসাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ১৯২০ সালে লক্ষ্ণৌ, ঢাকা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হলো ১৯২১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বোলপুর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৪৪]

মুসলমানদের শিক্ষা

---

[২৪১] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর, পৃঃ১২৯*

[২৪২] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃ:১৩১-১৩২*

[২৪৩] *সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ:৭৫*

[২৪৪] *অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫*

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ক্ষেও তাদের বিলম্ব ঘটে। একটি সংবাদপত্রের ভাষায় The educational seed was sown late into the mahomedan mind, and hence the crop was reaped. ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আয়ত্ত করে নেয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থভাণ্ডার ও গণমাধ্যম থেকে ব্যস্ততার সঙ্গে পাশ্চাত্য-অদর্শ আহরণ করে।[২৪৫] মুসলমানদের এ দুর্যোগময় মূহুর্তে আবির্ভাব ঘটে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮)। তিনি স্ব-ধর্মীয়দের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন যুগের চাহিদা অনুপাতে তাদের শিক্ষার পরিমাণ খুবই অকিঞ্চিতকর। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দ্বার তাদের জন্য রুদ্ধ। সৈয়দ আহমদ স্বজাতির এমন দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা দেখে মর্মাহত হলেন, তিনি একদা বলেন "শিক্ষা দাও, শিক্ষা দাও,শিক্ষা দাও, তাহলে এ অবস্থায় একদিন ভারতের সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাধি দূর হতে পারে। মূল ভাল কর তাহলে বৃক্ষ সুশোভিত হবে "।[২৪৬]

তিনি ইংল্যান্ড সফর করে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ১৮৭৭ সালে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৮৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে একটি সমিতি গঠন করে সারাদেশে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করা এবং এর বিস্তারের পথে সব বাধা বিপত্তি দূর করতে প্রয়াসী হন ।[২৪৭]

বাংলার অধঃপতিত এবং পশ্চাদপদ মুসলমানদেরকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছেন যিনি তিনি নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহন না করলেও পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ব্যপক আকারে এই শিক্ষা গ্রহন প্রমান করে যে নবাব আব্দুল লতিফের আন্তরিক ও অকৃত্রিম চেষ্টা বৃথা যায়নি । নবাব আব্দুল লতিফ তার মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মাধ্যমে মোহসিন ফান্ডের টাকা যাতে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় সে উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন । ' হাজী মোহাম্মদ মোহসিন ১৭৩৩ সালে এক ইরানী ব্যবসায়ী পরিবারে হুগলীতে জন্ম গ্রহন করেন । ১৮০০ সালে তিনি তার বৈমাত্রেয় বোন মন্নুজান

---

[২৪৫] *Sufia Ahmed p: 163*

[২৪৬] *গ্রাহাম পৃঃ ৭০, উদ্বৃত, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃঃ ৫৭০*

[২৪৭] *মুহম্মদ ইনাম-উল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭-৬৭*

Dhaka University Institutional Repository

খানুমের অর্পিত বিরাট সম্পত্তির মালিক হন । তিন বছর পর মাসিক একশ টাকা আয় হতে পারে ঐ পরিমাণ সম্পত্তি রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ওয়াকফ করে দেন । ঐ ওয়াকফ সম্পত্তির বার্ষিক আয় তখন ছিল পয়তাল্লিশ হাজার টাকা।[২৪৮] বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা এবং এক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলি যে প্রস্তাব পেশ করে , ভারত সরকার ১৮৭৩ সালের ১৩ ই জুন এক প্রস্তাবে তার মূল্যায়ন করে। এত বাংলা সরকারের শিক্ষানীতি ও সাধারনভাবে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদত হয় । ভারত সরকারের এই অনুমোদনের পর জর্জ ক্যাম্পবেল মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করেন । সৈয়দ আমীর হোসেন নামক জনৈক মুসলমান এই বিবৃতিকে প্রদেশে মুসলামানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে 'ম্যাগনা কার্টা ' বলে বর্ননা করেছিলেন।[২৪৯]

মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে আব্দুল লতিফ সৈয়দ আহমেদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন , ফলে ১৮৮১-৮২ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষারত কলেজেরে ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান ছিল একশ ছয়জন অপরদিকে মাদ্রাসা ছিল তিরিশজন । বোম্বেতে সাতজন , উত্তর-পশ্চিম প্রদেওশ উনত্রিশ জন , অযোধ্যায় সাতজন এবং পাঞ্জাবে তেরজন । বাংলার হাইস্কুলগুলোত সে সময় মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল তিন জন হাজার আটশ একত্রিশ জন , মাদ্রাজে একশ সতের জন , বোম্বেতে একশ আঠারো জন , উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ছয়শ সাতানব্বই জন , এবং পাঞ্জাবে ছিল একানব্বই জন । তাই উপযুক্ত পরিসংখ্যান থেকে বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে ও নবাব আব্দুল লতিফের অবদান উপলব্ধি করা যায় । নিঃসন্দেহে বলা যায় যে , আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফের অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী ও চিরস্মরণীয় ।[২৫০] ১৮৭০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২৫১] তবে কোম্পানী সরকারের যথাযথ যত্নের অভাবে এই শিক্ষা মুসলমানদের কে যথেষ্ট সুফল দেয়নি। বাংলার মুসলিম রেনেসার অগ্রদূত সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলমানদের মহাসংকট সময়ে তাদের সঠিক পথের দিশা

---

[২৪৮] *মুহম্মদ ইনাম-উল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯*

[২৪৯] *Sufia Ahmed, Ibid, পৃঃ ৮*

[২৫০] *মুহম্মদ ইনাম-উল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১-৯২*

[২৫১] *মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৭, পৃ.৮১*

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন । ইংরেজী শিক্ষার অপিরিসীম গুরুত্বের কথা তিনি স্বজাতি মুসলমানদেরকে বুঝাতে আপ্রান চেষ্টা চালান এবং সেই লক্ষ্যে ১৮৭৭ সালে 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামক প্রতিষ্টান গড়ে তুলে মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। আমীর আলী ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের নিকট মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে তিনি মুসলমানদের অব্যহত দারিদ্র্য , বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান শিক্ষক না থাকা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে দেখান । তিনি স্কুলের বেতন হ্রাস , মুসলমান এলাকার স্কুলগুলোত মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন। মোহসিন ফান্ড হতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং কলিকাতা মাদ্রাসাকে কলেজে উন্নীত করার জন্য তিনি দাবী করেন।

হান্টার কমিশন কর্তৃক মুসলমান ছাত্রদের লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিবাবকদের অভিপ্রায় সম্পর্কিত একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ্যযোগ্য :

"In Summing up its findings on the state of muslim education , the commssion drew attention to several factors whcih appered to handicap the muslim student thus it noted that for a Muslim the teaching of the mosque must have been giveb before a child entered an ordinary school. So a muslim boy entered school much later than a Hindu boy born at the same time . Secondly, the Muslim boy usally left school earlier than a hindu boy because his parents often could not pay for him to complete his education . The Mulim parents was usually poorer than the Hindu parent of a corresponding social status . And thirdly, the Muslim parents often decided to give his son such an education as would secure him a high place among the learned members of his own community rather

Dhaka University Institutional Repository

than one which would enable the child to complete for offices or enter modern professions .[252]

শিক্ষা কমিশেনের বৈঠক এবং ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি পেশের পরবর্তী বছরগুলোতে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি সরকারের নজর ছিল পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি। দীর্ঘকাল ধরে যে সকল প্রতিবিধান প্রস্তাব করা হয়েছিল , এ সময়ে তা প্রয়োগের জন্য গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা হয় ।[২৫৩] ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের এগিয়ে নেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয় । ১৮৭১ সালে উইলিয়াম হান্টারের মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদগামিতার করুণ বর্ননার পর থেকে ইংরেজ সরকার তাদের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করেছিল । ১৯০১ সালে একমাত্র কলকাতাতেই শিক্ষার জন্য যা ব্যয় হতো তা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মোট শিক্ষা ব্যয়ের চেয়েও বেশি । অবিভক্ত বাংলায ১৯০৩-১৯০৪ সালে সাধারন কলেজগুলিতে মোট ৮০০৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬৩ জন, বি.এ শ্রেনীর ২৮৪ ছাত্রের মধ্যে ৭৩ জন এবং এম.এ শ্রেনীর ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান ।[২৫৪] তবে বিশ শতকের শুরুতে বাংলায় বৃটিশ সরকারের গৃহীত কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপের ফলে শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। এ প্রসঙ্গে মুসলিম রাজনীতিবিদ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০-১৯৬৪) তাঁর জীবনীতে লিখেন, "এই অত্যল্প কালের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের, বিশেষত : মুসলমানদের যে উন্নতি হইয়াছিল পূর্বের ষাট বৎসরে তা হয় নাই।"[২৫৫]

এসময় কালে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে এক গবেষণায় ওঠে এসেছে, '১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। এ সময় মাওলানা আবু নসর ওহীদ(১৮৭২-১৯৫৩) প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা সমন্বয়ে একটি নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবসার পরিকল্পনা পেশ করেন (১৯১০)। তার সে পরিকল্পনা ১৯৭৪ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং

---

[২৫২] *Reprot of the Indian Education Commission 1883 , P 305 quoted , Sufia Ahmed , Muslim community in Bengal , p-21*

[২৫৩] *প্রাগুক্ত, ,পৃ ঃ ১৩*

[২৫৪] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত , পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৮*

[২৫৫] *খান বাহাদুর আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ, আমার জীবন, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ: ৭১*

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫ সালে তা প্রবর্তিত হয়। এ স্কীমের বৈশিষ্ট্য দিল এই যে, এ শিক্ষানুরাগীতে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ---এ স্কীমের জন্য যে পাঠ্যসূচী সুপারিশ করা হয়, তা ছিল এইঃ কুরআন, উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজী, আরবী, অংকন, সূচীকর্ম ও ড্রিল। নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদের বিশেষত পূর্ব বঙ্গীয় (বর্তমান বাংলাদেশী) মুসরমানদের বিশেষ বাবে উন্নতি সাধিত হয়।[২৫৬] বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের নতুন দরজা উন্মুক্ত হয় । প্রথম লেফটেন্যান্ট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের সূছতি নীতিমালা অনুযায়ী হেনরি শার্প মুসলমানদের শিক্ষা সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন । সরকারের গৃহিত ইতবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে ১৯১২ সাল নাগাদ প্রতিটি সরকারী হাইস্কুলে মুসলিম হোস্টেল গড়ে উঠে ।

মুসলিম শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার আরও যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করে সেগুলি হচ্ছে ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা , জনশিক্ষা ও পরিদর্শন দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পূর্নগঠন , মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীতে সেক্যুলার বিষয় অর্ন্তভূক্তিকল্পে মাদ্রাসা কারিকুলাম সংস্কার ।[২৫৭]

তবে, স্বল্পস্থায়ী এ সরকারের শিক্ষানীতির উজ্জলতম অর্জন ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘোষনা । এ ঘোষণাকে আমরা স্বচ্ছন্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল বলে ধরে নিতে পারি।[২৫৮] কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় । ইহার ফলে পূর্ববাংলা আসামের উন্নতির পথরুদ্ধ করা হয়। এই অঞ্চলে মুসলমানগন সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। নবগঠিত প্রদেশে তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাহারা উন্নতির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয় । মুসলমানগন সরকারের প্রতি ক্ষুদ্ধ হয় । তাহাদেরকে সান্তনা দিবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্চ ১৯১২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী ঢাকায় আসেন । এই সময় ঢাকার নেতৃত্ব স্থানীয় মুসলমানগন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষন করেন। বড় লাট বুঝিতে পারেন যে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মুসলমানদের খুব ক্ষতি হইয়াছে । তাহাদের ক্ষতিপুরনের জন্য তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। ২ রা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারী

---

[২৫৬] *চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ. ৪৪*

[২৫৭] *পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট - উদ্বৃত , সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত , বাংলাদেশের ইতিহাস , পৃঃ৭৯*

[২৫৮] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০*

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনায় প্রকাশ করা হয় ।[২৫৯] এ সময়ের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও সে কথাই বলে । প্রদেশের মোট শিক্ষাব্যয় ১৯০৬-০৭ সালে ১৩, ২৮, ১২৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সালে পাড়ায় ২,৫৩৩,৫৬৯।[২৬০] ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল এ পাঁচ বছর সময়ে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোট ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৩১,৯০০ (১৯০১-১৯০২) থেকে ৪,২৫,০০০ জন (১৯০৬-১৯০৯) এবং ৫,৭৫,৭০০ জন (১৯১১-১৯১২) হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রতি ঝোঁকটাও ছিল লক্ষণীয়। ১৯০৬-০৭ সাল থেকে ১৯১১-১২ সালের সময় সীমায় প্রাথমিক স্তরে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫৮ ভাগ এবং কলেজ স্তরে শতকরা ৪০৭ ভাগ হবে।[২৬১] ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভারত সরকার ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। ইতঃপূর্বে হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন।[২৬২] ডফলিপ জে, হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চেন্সলর নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়।[২৬৩]

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি তা অত্যন্ত ধীরলয়ে এগিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকেও এই গতি দেখা যায় মন্থর। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রবন্ধে আনোয়ার হোসেন লিখেছেন,

"শিক্ষা বিষয়ে আমরা বাঙালী মোছলমান কতদূর অনুন্নত, তাহা কল্পনা করিলেও নৈরাশ্যের অন্ধকার আমাদের মনকে ছাইয়া ফেলে। মোছলমান আজ ব্যবসায়, বানিজ্যে, শিল্প প্রভৃতি অথকরী ব্যাপারেও পিছনে পড়িয়া আছে । উকিল, ডাক্তার, কেরানী ও নকলনবিশের কাজ হিন্দুরই একচেটিয়া। অফিস আদালতে, মহাজনের গদিতে, সওদাগর অফিসে, রেল ষ্টীমার স্টেশনে আমরা

---

[২৫৯] *ক্যালকাটা ইয়ুনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট , ৪র্থ খন্ড , ১২২-১৫১, উদ্বৃত , এম এ রহিম , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩*

[২৬০] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯*

[২৬১] *British policy and administration in Bengal, ১৯০৫-১৯১২, উদ্বৃত সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০*

[২৬২] *এম.এ.রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৪*

[২৬৩] *এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫*

Dhaka University Institutional Repository

আজ দুই একজন মোছলমান কর্মচারী দেখিতে পাই। তাহারা "hewers of wood and drawers of water ব্যতীত আর কি?"[২৬৪]

সাহিত্য

কেউ কেউ ১৮০০ ঈসায়ী সনকে বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। এ বছর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনায় বাংলা গদ্যরীতির যে বিকাশ সম্ভাবনা দেখা দিল,তা আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করল,একথা সত্য। কিন্তু যথার্থ আধুনিকতা–পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব , মানবমুখিতা, সমাজ-সচেতনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও আত্মভাবতন্ময়তা প্রভৃতি দেখা দিল আরো পরে , ১৮৬০ এর কাছাকাছি সময়ে।[২৬৫] ১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যাকাশে মুসলমান লেখকের অনুপস্থিতিতে বিস্ময়কর হলেও ঐতিহাসিক সত্য।[২৬৬] ওহাবী ও ফরায়েজী ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন প্রভাবিত নিম্নবঙ্গে হিন্দু প্রাধান্যের বিরোধীতা করেও মুসলিম সাহিত্যের এক নতুন উন্মেশ লক্ষ্য করা যায়। "ফলে নিম্নবঙ্গেও সাধারণ মুসলমানেরা তাহাদের বাংলা ভাষাকে হিন্দুদেও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদ স্বরূপ ফারসী,উর্দু

[২৬৪] *মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭) উদ্ধৃত, দিলওয়ার হোসেন সম্পাদতি, মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ২*

[২৬৫] *আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ.১০১*

[২৬৬] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২০৮ পৃ:*

Dhaka University Institutional Repository

ও হিন্দী ভারাক্রান্ত করিয়া এক সতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।এই ভাষা 'ওহাবী' বা 'ফরায়েজী' আন্দোলন হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক বিরাট ধর্মীয়-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পায়।[২৬৭] শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান প্রাচীন ধারায় মিশ্র ভাষায় পুথি সাহিত্য ও অশিক্ষিত মুসলমান আঞ্চলিক ভাষায় লোক সাহিত্য রচনা করেছেন,কিন্তু আধুনিক ভাবধারায় শুদ্ধ বাংলায় তারা গদ্য বা পদ্য রচনায় অগ্রসর হননি।[২৬৮] এই পুথি সাহিত্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর বিষয়বস্তু ছিল মূলত অতীত দিনের কাহিনী, কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সর্বস্ব।ফলে সাহিত্যের ভিন্নমাত্রিক আমেজটুকু বাদ দিলে তর মধ্যে সমকালীন সমাজের জীবনবোধ আত্মজিজ্ঞাসা ও জেগে উঠার উচ্ছাস আদৌ লক্ষ্য করা যায়না।আর বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলার সাথে হিন্দী, ফারসী,আরবী ও তুর্কী ভাষার ব্যাপক মিশ্রণের কারণে তা অনেকটা "মিশ্রভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত হতে পারে।"[২৬৯] ড: সুশীলকুমার দের অভিমতকে গ্রহণ করে আনিসুজ্জামান লিখেছেন "....১৭৬০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত সময়কে আমরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বতী ক্রান্তিকাল বলে গন্য করতে পারি।"[২৭০] বাস্তববোধের তাগিদে–কোথাও সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুরোধে–এই কবিরা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করেছে।এটাকে সম্পূর্ণ রচনায় ভাষারীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি।[২৭১] চব্বিশ পরগনার কবি কৃষ্ণরাম দাস ও রামাই পণ্ডিত প্রমুখের লেখায়ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।বিষয়টিকে পরিষ্কার কওে : আনিসুজ্জামান লিখেছেন "বিষয়বস্তু দিক দিয়ে মিশ্রভাষারীতির কাব্যগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যন ঃ যেমন,'ইউসুফ-জুলেখা','লাইলী-মজনু', 'বেনজীর বদরে মনীর','হুসনাবানু-মনীর শামী ('হাতেম তাই'),'গোলে বকাউলী-তাজুলমুলক','সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারার উপাখ্যনগুলোকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর দুই ভাগ–ছদ্ম ঐতিহাসিক আর লৌকিক। প্রথম পর্যায় পড়ে 'আমীর হামজা', 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি কাব্য অর্থাৎ ইতিহাসের পটে মুসলিম বীরদের কাল্পনিক কাফের- দলন-কাহিনী। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই আমাদের দেশের পটভূমিকায় হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর

---

[২৬৭] *ড. মুহাম্মদ এনামুল হক-১৭৭ পৃ:*

[২৬৮] *ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২০৮ পৃ:*

[২৬৯] *আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, ১০৩*

[২৭০] *আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১০২পৃ:*

[২৭১] *আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১০৮ পৃ:*

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কওে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমান পীর ফকীরদের প্রতিষ্ঠালাভের কথা,যেমন,'বনবিবির জহুরনামা','কালু গাজী-চম্পাবতী','লালমোন','সত্যপীরের পুঁথি' প্রভৃতি। তৃতীয় ধারায় পাই ইসলামের ধর্ম, ইতিহাস, নবী- আউলিয়ার জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ রচনা,যথা 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল অফলিয়া','হাজার মসলা' প্রভৃতি। ধর্মভাবকে আশ্রয় করে সুফী মরমীবাদের অবলম্বনে মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা অনেকাংশে প্রবাহিত হলেও এসবের সাথে ওহাবীদের শরীয়তী ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্রধারা এবং হিন্দু মুসলিম মিলিত মর্সিয়া সাহিত্যেও চর্চা বিদ্যমান ছিল।

আধুনিক কালের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এমনকি সভ্যতারও ব্যপক বিস্তৃতির ফল। প্রফেসর সুফিয়া আহমদ বলেন,প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমুহে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করার ফলে বাঙালিরা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার সুযো পায়।[২৭২]

মিশ্র ভাষারীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,"এক কথায়,মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকে আমরা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ধারার নিদর্শন বলে গণ্য করতে পারি–সমাজ জীবনের ক্ষয়ের চিহ্ন এখানে স্পষ্ট।[২৭৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আদিতে ভারতীয় সভ্যতার লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে ডক্টও হারমান গোয়েৎজ যে বিশ্লেষণ করেছেন তার আলোকে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,মিশ্র ভাষারীতির কাব্য শুধু গতানুগতিক ও জৌলুসহীন নয় ক্ষয়িষ্ণুতার আরো চিহ্ন এতে স্পষ্ট। যেমনঃ "বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার চেষ্টা। ডক্টর গোয়েৎজ বলেছেন যে, হয় নেশার মধ্যে, অথবা ইশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে বর্তমান থেকে পালিয়ে থাকার আশ্রয় মেলে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত চিত্তের পরিচয় পাই। এই কাব্যধারায় যে জীবনের প্রশংসা আছে, সেখানে ঐহিক কামনার চেয়ে পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই বড় হয়ে উঠে। তাই এতে যেমন দেখা যায় দরবেশের কাহিনীর প্রাধান্য, তেমনি প্রণয়কাব্য ও যুদ্ধকাহিনীর নায়ককেও দেখি অলৌকিক শক্তিতে বলিয়ান।"[২৭৪]

জোনাব আলীর (১৮৮২) কাব্যে মিশ্র ভাষা রীতির কবিতায় সমকালীন অবস্থা ফুটে উটে–

আগে জামানার বীছে নবাবী আমলে ।

---

[২৭২] *Sufia Ahmed, Ibid, p.305*

[২৭৩] *আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, ১৩৪ পৃঃ*

[২৭৪] *আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, ১৩৫*

Dhaka University Institutional Repository

ইংরাজের আমল না ছিল যেই কালে ।।
সেইকালে বাজে লোক বাঙ্গালা দেশের ।
ইসলামী তরিকা না ছিল তাহাদের ।।
জানিত না দ্বীন আর ইসলামী ঈমান।
মুখে খালি ফলাইত সুন্নী মুসলমান ।।
হিন্দুদের দেখে শুনে করিত সে কাম।
শেরেক বেদাতে ছিল ভরিয়া তামাম।।
হেনকালে আল্লা-পাক দয়াল খোদায়।
মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া দিল বাঙ্গালায়।।
সৈয়দ আহম্মদ শাহে মোজাদ্দেদ করি।
মিটাইল বাঙ্গালার শেরেক কুফরি।।

সমসাময়িক সময়ের মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চট্রগ্রামের খান বাহাদুর হামিদুল্লা খান (১৮০৮-১৮৭০) । ফারসী তওয়ারীখ-ই-হামীদিয়ার রচয়িতা হামীদুল্লাহ খানের 'ত্রানপথ' ও গুলজার-ই-শাহদত 'শাহদুতুদ্যান' বাংলা সাহিত্যেও মুল্যবান সম্পদ। ১৮৬৮ সালে তার বা-ই নাজাত' বা ত্রাণপথ প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় উপদেশবাণীকে তিনি উপভোগ্য করে লিখেছেন এ গ্রন্থে। যেমনঃ–

দাড়ি মুখে দিল প্রভু পুরুষ লক্ষণ।
নারী খোজা-মুখে দাড়ি না হয় কখন।।
আপনার পুরুষত্বে কি মন্দ দেখিলা।
যার জন্য পুরুষত্ব লক্ষণ ত্যজিলা।।[২৭৫]

হামীদুল্লাহ্ খানের গ্রন্থগুলি মুঘল-প্রভাবের অবসান ও বাংলা-কাব্যে নব্য ধারার সুচনা-এ্ই দুই যুগের সন্ধি-সময়ের নিদর্শন।[২৭৬]

---

[২৭৫] *হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫, পৃঃ১৯০*

[২৭৬] *ড. মুহাম্মদ এনামুল, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৯০*

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এই সংযোগের ফলে বাংলায় এক নব জাগরণের সৃস্টি হয়, যাকে বঙ্গীয় রেনেসা নামে অভিহিত করা হয়।[২৭৭]

কেননা ইউরোপীয় মডেলকে সামনে রেখে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালিরা নতুন বিষয়ে নতুন ধরনের গদ্য রচনা শুরু করেন।[২৭৮]

বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুরুতেই হিন্দুরা আগ্রহভরে গ্রহণ করে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন, যে নবযুগ দেখা দেয় তাতে হিন্দুদের অবদান অনস্বীকার্য।

The change can be traced, perhaps to as far back as1800 when Fort William College was established in Calcutta. From the college came works in bengali prose which provided the foundations for the subsequent vast edifice of bengali prose writing.for until the 19th century bengali had been used only in the writing of verse.the hindus, imbibing new western ideas through the medium of english, began to use the developing prose forms to express their new ideas.[২৭৯] ফলে সাহিত্যে হিন্দু ভাবধারা ও ব্যাপকতর হয়ে উঠে। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন,"আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে উঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।"[২৮০]

মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তাদের অনেকেই আবার ইতিমধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ফলপ্রসু কর্মনীতি নিয়ে এগিয়ে আসেন। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন,

"নতুন পরিবর্তনের যুগেও আবার একটা দোলাচল অবস্থা ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে ওঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না; আবদুল লতিফ সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে কোর্ট-কাচারীতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাংলাকে গ্রামের মুসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অভিমত

---

[২৭৭] *Sen, d,c, history of bengali language and literature,p:882 ,muslim community-305*

[২৭৮] *Sen, Ibid, পৃ: ৩০৫*

[২৭৯] *Sufia Ahmed, Ibid, 3o5,306*

[২৮০] *ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ:২১০)*

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত দ্বন্দ্বেও অনেকে বিচলিত ও শঙ্কিত ছিলেন। উপরের ইংরেজ-আমলে বাংলার মুসলিম-সাধনার দিশারী-স্বরুপ যে-সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে,১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন মুঘল-ঐতিহ্যবাহী বাংলা-সাহিত্য-সাধনাই চলিয়াছে। ইহাকে 'প্রাচীন সাহিত্যিক ধারার অনুবর্তন' বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার সহিত পাশ্চাত্য-প্রভাবের কোন যোগাযোগ নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরেই তাহারা বাংলা-সাহিত্যের নব-গদ্যধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মীর মোশাররফ হুসেনের(১৮৪৭-১৯১২)'রত্নাবতী' নামক উপন্যাসই আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য-প্রভাবপুষ্ট প্রথম বাংলা গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়। 'রত্নাবতী'র(প্রকাঃ-২রা সেপ্টেম্বও, ১৮৬৯)পর হইতে বাংলা সাহিত্যেও এই ধারায় মুসলমানেরা যে সাধনা করেন, তাহাকে'নব্য বাংলা-সাহিত্য ধারা' নাম দেওয়া যাইতে পারে। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান সমাজের মধ্য হইতে কতিপয় প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাবই তাহার প্রমাণ। তাহাদের মধ্যে মীর মোশাররফ হুসেন(১৮৪৮-১৯১২), মওলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন(১৮৩২-১৯১৬), কায়কোবাদ(১৮৫৮-১৯৫২), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), শেখ আবদুর রহীম(১৮৫৯-১৯৩১), মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ(১৮৬২-১৯৩৩), ডাক্তার আবুল হোসেন(১৮৬০-১৯১৯), মওলভী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, তসলিমউদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৮), মুন্‌শী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (১৮৭০-১৯৩০), কবি আবু মালি মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৬৫-১৯৫৩), মৌলভী আব্বাস আলী,কবি আর্জুমান্দ আলী (১৮৭০-১৯১৪),আবদুল হামিদ খান ইফসুফজায়ী (১৮৪৫-১৯১০?), আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩),নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী (১৮৬৪-১৯২৪), মওরানা মোহাম্মদ মুনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখ মুসলিম মনীষী ও সাহিত্যিকই প্রধান।মীর সাহেব আধুনিক যুগের মুসলিম বাংলা-সাহিত্যিকদেও প্রথম দলের সর্বাগ্রহণ্য ব্যক্তি।ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কনিষ্ঠ সমসাময়িক লেখক।তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জিলার) 'লাহিনীপাড়া' গ্রামে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব বেশী দূও ইংরেজী শিক্ষা পান নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতি-নাট্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সমাজ-চিত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রায় ৩০ ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান:-

(১) রত্নাবতী-২রা সেপ্টেম্বের, ১৮৬৯-উপন্যাস

(২) গৌরীসেতু-১৮৭৩-কাব্য

(৩) বসন্তকুমারী– ১৮৭৩– নাটক

(৪) জমিদার-দর্পণ–১৮৭৩–নাটক

এর উপায় কি?– ১৮৭৬– প্রহসন

(৫) বিষাদ-সিন্ধু–১৮৮৫-১৮৯১–মহরমের ঘটনাভিত্তিক উপন্যাস

(৭) সঙ্গীত-লহরী–১৮৮৮–গান

(৮) গো-জীবন–১৮৮৯–প্রবন্ধ

(৯) বেহুলা-গীতাভিনয়–১৮৮৯–গীতি-নাট্য

(১০) টালা-অভিনয়ে–১৮৯৯-যাত্রা

(১১) গাজী মিঞার বস্তনী–১৮৯৮-১৮৯৯ সমাজ চিত্র (রস-রচনা)

(১২) মৌলুদ শরীফ–১৯০২–গদ্য ও পদ্য,ধর্মীয় গ্রন্থ

(১৩) মুসলমানের বাংলা শিক্ষা–১৯০৩-১৯০৮–শিক্ষা-বিষয়ক

(১৪) আমার জীবন–১৯০৮-১৯১০-আত্মজীবনী

উপন্যাস, জীবনী, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গান-এমন কোন সাহিত্যিক বিষয় নাই,যাহা মীর সাহেব বাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' আজও অসাধারণজনপ্রিয় গ্রন্থ। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল। মুসলিম গেন্রব-গাথা তাঁহার জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি নানা কাব্যে বাংলার মুসলমানকে প্রাচীন মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন মীর মোশররফ হোসেন (১৮৪০-১৯১১)। ১৮৮৫ সালে তাঁর অমূল্যগ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' প্রকাশ পায়। এতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেন। মোহাম্মদ কাজিম আল কোরেশী (১৮৫১-১৯৫১) যিনি কায়কোবাদ নামে সুপরিচিত, তিনি অনেক কাব্য গ্রন্থ লিখে যান। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) বাংলা সাহিত্যে গবেষণার ছাপ রেখে যান। তিনি 'প্রাচীন পুথির বিবরণ' ও কয়েকটি প্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ সম্পাদন করেন।[২৮১] নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পের স্রষ্টাও বটে। এ শতকের প্রথম দশকেইপ্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস: চোখের বালি (১৯০১), নৌকাডুবি (১৯০৩) এবং গোরা (১৯০৯)। চোখের বালি ও নৌকাডুবি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বটে। গোরাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।[২৮২] বাংলা উপন্যাসের মোহন যাদুকর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩২)। তাঁর প্রথম উপন্যাস বড় দিদি(১৯১৩), প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেন। অনেক সমালোচকের মতে, এখনও তিনি বাংলা ভাষার অপরাজেয় কথাশিল্পী।[২৮৩] রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষার প্রধান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। ছোট গল্পকার হিসেবেই সাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ব্যথার দান (১৯২২) তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থও বটে। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ রিক্তের বেদন (১৯৩১) এ সংকলিত হয়েছে আটটি গল্প এবং তৃতীয় এবং শেষ গল্পগ্রন্থ শিউলি মালায় (১৯৩১)-য় রয়েছে চারটি গল্প।[২৮৪] নজরুলের সাহিত্যিক প্রতিভা পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে সমভাবেসমভাবে বিকাশ লাভ করে। নজরুল একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরশিল্পী, সংগীত রচয়িতা, ভাবপ্রবণ, ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও নাট্যকার। তাহার প্রথম কাব্য অগ্নিবীণা ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য মরুভাস্কর। তাঁহার কাব্যগুলোর মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, দোলনচাপা, ফণিমনসা, ভাঙার গান, ছায়ানট, সর্বহারা, সাম্যবাদী, চিত্তহারা, সিন্ধু হিল্লোল, চোখের চাতক, চক্রবাক, জিঞ্জীর, ঝিঙেফুল, চন্দ্রবিন্দু, নতুন চাঁদ প্রভৃতি খ্যাতি অর্জন করেছে। (এম.এ. রহিম পৃ: ১১৯)। নজরুল ইসলাম মাত্র দুই দশকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তার তুলনা নাই। ১৯৪১ সালের পর হতে দুরারোগ্য রোগ এই তেজস্বী কবির প্রতিভা স্তব্ধ হয়েছিল।[২৮৫] মুসলিম ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭০-১৯৩১)। তিনি সিরজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমানদেরকে নিজেদের অতীত কৃষ্টি সম্বন্ধে সজাগ করেন এবং তাদেরকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ

---

[২৮১] *এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৮,১১৯*

[২৮২] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৩*

[২৮৩] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৪*

[২৮৪] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৫)*

[২৮৫] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১*

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি তাঁর 'অনল প্রবাহ' কাব্যে (১৯৩০) মুসলমানদেরকে তাদের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়া দেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অনল বর্ষণ করেন।[২৮৬] মৌলবী ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), ডঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৭-১৯৩৬) ও ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬) বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্ব অর্জন করেন। নজিবুর রহমান (১৮৭৮-১৯৩৫) সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁহার 'আনোয়ারা' ও 'প্রেমের সমাধি' সামাজিক উপন্যাসদ্বয় মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়। এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে। কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭) সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার লিখিত সামাজিক উপন্যাস 'আবদুল্লাহ' বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ফজলুর রহীম (১৮৯০-১৯৩৩), ইকরামউদ্দিন (১৮৮২-১৯৩৫), শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস (১৮৯৫-১৯৪৫), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মুস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মাওলানা আকরম খান (১৮৬৯-১৯৬৮), জসীমউদ্দিন (১৯০২-১৯৭৬), ডঃ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবির প্রতিভায় মুসলিম বাংলা সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

বাংলা ভাষার দু'জন ভাষা-বিজ্ঞানী–সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮০-১৯৬৯) এ বিষয়ে অবদান অনেক বিস্তৃত। চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯)-য় বাংলাভাষার বিস্তৃত পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন।[২৮৭] উনিশ শতক মুসলমানদের জন্য ছিল কঠিন সময়। তারা ওই শতকের শেষ দিকে অথবা বিশ শতকের প্রথম দিকে এসে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা অনুধাবন করতে থাকে। বিশেষ করে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা কিছুটা উন্মুক্ত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মুসলমান লেখকরা কোন সৃষ্টিশীল মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে অসামান্য অবদান রাখতে না পারলেও চিন্তামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য বিশ শতকের প্রথম দিকের মুসলমান লেখকদের অবদান সামান্য নয়। বিশেষ করে আর্থ সামাজিক ধর্মীয়

---

[২৮৬] *এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৮*

[২৮৭] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, পূর্বোক্ত,পৃ: ২৪০*

Dhaka University Institutional Repository

ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁরা প্রচুর লিখেছেন, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের অবদান স্বীকার করতেই হবে।[২৮৮]

শুরু থেকেই হিন্দু লেখকরা যেমন সমকালীন বিষয়ের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম নিয়েও প্রচুর লিখেছেন, সম্ভবত তাঁদের অনুকরণে মুসলমান লেখকরাও ইসলাম ধর্ম ও প্রাচীন মুসলিম সভ্যতা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চেষ্টা করেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয়ের অনেকটাই অধিকার করে থাকে ইসলাম ও মুসলমান এবয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতা , ইসলামের মহাপুরুষদের জীবন ও চিন্তাধারা অর্থাৎ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।[২৮৯]

সংস্কৃতি

কোন জাতির নিজস্ব যা কিছু রয়েছে তাই সে জাতির সংস্কৃতি। তার মধ্যে তাদের চাল-চলন,অচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, আনন্দ-বিনোদন,সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-প্রথা সবই অন্তর্ভুক্ত। জীবনযাত্রা, পেশা, উৎপাদন, সুযোগ-সবিধা ইত্যাদির ব্যবধানের দৃষ্টিকোন থেকে সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতি ও শহুরে ও গ্রামীণ এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। ভারতীয় উপমহদেশে নবাবী শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এদেশের সমাজ সংস্কৃতির উপরেও পড়েছিল। নবাবী আমলে

[২৮৮] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৩*

[২৮৯] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৩*

Dhaka University Institutional Repository

শহরগুলো গড়ে উঠেছিল কোন কোন উৎপাদন বা ব্যবসা-বানিজ্য বা রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে। এমনকি রাজধানী মুর্শিদাবাদও ছিল নানাভাবে উৎপাদনের সংগে সম্পর্কিত। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের পরও এ নগরের লোকসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কারণ এর ফলে ঢাকার উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বানিজ্য লক্ষনীয় ব্যহত হয়নি।[২৯০]

গ্রাম চিল মানুষের স্থায়ী ঠিকানা ও পরিচয়। চাকুরেদের জন্য শহর ছিল অস্থায়ী নিবাস। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মফস্বল শহরগুলির আবির্ভাব ঘটে জেলা প্রশানকে কেন্দ্রকরে। শিল্প ও ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যে জন্য মফস্বল মহরগুলির জনসংখ্যা সীমিত থাকে। এর প্রশাসনিক প্রয়োজনের মধ্যে; অর্থাৎ জেল কর্মকর্তা কর্মচারী,অধস্তন পিয়ন -দারোয়ান-বরকন্দাজ ,উকিল, মোক্তার আর এদের ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী কিছুসংখ্যক দোকানী, কারিগর, ঠিকাদার, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে।

ব্যবসা উপলক্ষ্যে এদেশে ইংরেজদের আগমন ঘটলে ও ক্রমান্বয়ে শক্তি অর্জন করে তারা দেশের ধণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে বসেন। একদিকে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিশেষ পরিমণ্ডল তৈরি করতে গড়েছে ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন, খেলার মাঠ, নাচের আসর ইত্যাদি। কার্য উপলক্ষে ভারতীয়দের সাথে সখ্যতা সৃষ্টি করতে এদেশীয়দের আচার-ব্যবহার, আহার-ভোজন ইত্যাদি ও বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে।

ইংরেজরা এদেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মাঝখানে দোলাচলে দুলেছে। "যে যুগে কোম্পানির ইংরেজ দুর্নীতিবশে অসদুপায়ে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে, রায়তদের পীড়ন করেছে, জেনানা রেখে অবৈধ যৌন সংসর্গে মেতেছে,সেকালের ইংরেজই ভারতীয় কালচারে আকৃষ্ট হয়েছে, ফারসি কবিতা লিখছে, পণ্ডিত মৌলবী ও নবাবদের সঙ্গে একাসনে বসেছে বন্ধুর মতো।বেদনার কথা এই যে,কর্ণওয়ালিস যেমন দুর্নীতির নব উৎস রুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সামাজিক ভারসাম্যটাও নষ্ট করে

---

[২৯০] *সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়া- পৃ. ৩/১১*

Dhaka University Institutional Repository

ফেলেছিলেন, অথচ এটি ব্যাতীত পারস্পরিক চেনা-জানা অসম্ভব। ...কর্নওয়ালিস সব উচ্চ পদ থেকে ভারতীয়দের বিতাড়িত করে এক নতুন শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন।[২৯১]

আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

"এটা সবাই জানেন যে,সমাজই কালচারের জননী বা সূতিকাগার। বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয় দুইটা। সে দুইটা সমাজ এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া-পরা, বিবাহ-শাদি, ইত্যাদি সামাজিক মিল নাই। তাই এগারশ' বছর এক দেশে বাস করিয়া, একই খাদ্য পানীয় খাওয়াও তারা দুইটা পৃথক সমা্জ রহিয়া গিয়াছে। এক সমাজের লোক জন্মিয়া খৎনা করিয়া নিজস্ব সমাজে বাস করিয়া মরিয়া গোরস্থানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্ত ও উপনয়ন করিয়া নিজের সমাজে বাস করিয়া মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ অশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।"[২৯২] বৃটিশ বিজয়ের প্রথম থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং তারাই নতুন সংস্কৃতির পত্তন করে।[২৯৩] ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ হয়ে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধর্মের প্রতি বাধন আলগা হয়ে যায়। তারা বিলাত ফেরতই হোন আর পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অভ্যাসই গড়ে তুলুন তাতে তারা ইংরেজদের কাছে বাবু বলে পরিচিতি পান। তারা আচরণে, আহারে ও পানীয়তে উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে ,আর তাদের হাতে জন্ম নেয় নতুন সংস্কৃতি। "সংক্ষেপে বলা যায়, পোশাকে বিলেতি বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে, মুখে বুলিতে ও হাবে ভাবে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এরুপ ইংরেজিয়ানা রপ্ত করে ফেলেছিল যে, হিন্দুত্বের বা ভারতীয় বাঙালির অতি অল্প চিহ্নই তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও হিন্দু নব্য সংস্কৃতির বিধায়কগণ অচল ধর্মীয় ও সামাজিক অচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। হিন্দুর সমাজ

---

[২৯১] *The Nabobs: A study of the social life of the english in eighteenth century-p.spear, pp 136-137, উদ্বৃত, আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৯ পৃঃ ২৪৩*

[২৯২] *আহমদ, আবুল মনসুর: বাংলাদেশের কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৬, পৃঃ ২১*

[২৯৩] *আব্দুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪*

Dhaka University Institutional Repository

বিন্যাসের ভিত্তি ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা, সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, রাষ্টীয় আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলনে ছিল তাদের সক্রিয় কর্ম ভূমিকা।তার ফলশ্রুতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সমৃদ্ধির সহায়তা করলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, এসব কর্মে এমন সামাজিক পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছিল, যার সৃষ্টিধর্মী প্রভাব হিন্দ ুগণজীবনেও কিছুটা অনুভূত হয়েছিল। ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক রীতীনতি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার ইত্যদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যপক তাৎপর্য স্মরণ করলেই এ কথাটি সম্যক উপলব্ধি হবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এদেশের দীর্ঘ কালের হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতিতে অঘাত করেছিল বটে- তবে নৈতিকতা বোধ কিংবা নতুন চেতনার জগতে তেমন মহৎ কিছু সঞ্চারিত করতে পারেনি। ইংরেজদের শাসন ও শোষণে এদেশের মানুষ নিঃস্ব হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে আর উপর তলার লোক বিলাসী, অসাধু আর ভোগবাদী হয়েছে। এদেশীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উদ্ভব সমন্বয় প্রচেষ্টা ও ক্ষেত্র বিশেষেদেখা গেছে, তবে সে সবগওলো অগোছালো ও অস্থায়ী প্রয়াস ছিল। বিনয় ঘোষ যথার্থই লিখেছেন, "সেই ভাব-সমন্বয়ের মর্মান্তিক বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছে,প্রকৃতির মতন অর্থনীতির নির্মম প্রতিশোধের আগুনে সমস্ত সংস্কৃতি-সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জরাগ্রস্ত জীর্ণ সমাজ সেই ভস্মস্তুপের মধ্যে আত্মবিস্তৃত হয়ে পিশাচ বৃত্তি চরিতার্থ করেছে। 'মহাপতক' জনগণসাধকদের আদর্শউপলব্ধি করেনি, সমাজ ঘুমিয়েছে, তলার মাটির শীতল নিষ্ক্রিয়তায় সাধারন মানুষ ও ঘুমিয়েছে। ঘুমভাঙা ও ভাঙানোর পালা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দি থেকে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পরে ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সমন্বয় হলো হিন্দু মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতির। এই হিন্দু মুসলমানের নতুন ভারত সংস্কৃতিকে আঘাত করল বৃটিশযুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি। "[২৯৪]

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ছিল কল্পজাগতিকতা, বস্তু জগৎ থেকে সেটি আলাদা ও প্রচ্ছন্ন। যেমনটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের কথা ছিল "মানুষের জন্ম- মৃত্যু, খরা, প্লাবন, লাঙ্গল, মহামারী, গবাদি পশুর মড়ক, মৎস, বৃক্ষ-লতা সবকিছুর দায়িত্বে রয়েছে কোন কোন দৈব শক্তি।"[২৯৫]

---

[২৯৪] *বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯পৃঃ ৭৮০*

[২৯৫] *সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম কৃষক সমাজেও ছিলনা আচার প্রথা, যা কৃষির অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে থাকে ,যেমন বৃষ্টির জন্য গণ প্রার্থনা; মহামারী, গো-মড়ক ,প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পীর-ফকিরের কাছে মানত; স্থ ও নৌপথে ভ্রমণে নিরাপত্তর জন্য দরগা-খানকায়ে দোয়া-প্রার্থনা;জিন-পরীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য মুষ্টি রাখা;বাড়িতে সম্পত্তি ও মাঠে ফসল চুরি রোধ করার জন্য যথাক্রমে বাড়িবন্ধ ও ক্ষেতবন্ধ দোয়া প্রয়োগ ইত্যাদি ঐশী উপাদানের আশ্রয় নেয়া।"[২৯৬] এভাবে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই কল্পনা জগত দ্বারা নির্মিত ছিল। গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল উপাদান তাদের আয় উপার্জনের উৎস থেকেই অনেকাংশে এসে যোগ হয়েছে। যেমন হিন্দু সমাজ দর্শনে রয়েছে,"শিবের স্ত্রী দুর্গার অপর নাম অন্নদা, অন্নপূর্ণা।"[২৯৭] ....নদীবাহিত অঞ্চলের জেলে গ্রামের দেবদেবী এবং পূজনীয়-আরাধ্য সম্পর্ক যুক্ত জল ও মাছের সঙ্গে। অনুরুপভাবে অরন্যচারী-পাহাড়ী মানুষের আরাধ্য আচার অন্য কিছু। বাকেরগঞ্জে ধান ছিল জীবিকার এমনি এক কেন্দ্রীয় বস্তু যে, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শুভযাত্রা, শভাগমন ও সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ধান-দুর্বার ব্যবহার ছিল সর্বজনীন।[২৯৮] বাংলার মুসলমানেরা গ্রামে হিন্দুদের দুর্গোৎসবে যোগ দেয়। হিন্দুরাও মুসলমানদের ঈদ, মহরমে আনন্দ করে। ওলাওঠা বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধির মড়কের সময় হিন্দুদের মতন বাংলার মুসলমানরাও শীতলা ও রক্ষাকালী পূজা করে। বাংলার 'সত্যপীর' হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র দেবতা।'সত্যপীরের' মতন 'মানিক পীর' ও 'কালু গাজী' ও হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা।[২৯৯] বাঙালী মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে মূল ইসলামের অনুশাসন পালিত হতো খুব কম। বাঙালী মুসলমানদের দৈনিন্দ জীবনে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপাদান ছিল খুব লক্ষণীয়। এক কথায়,আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এরা ছিল আধ হিন্দু আধা মুসলমান।[৩০০]

---

[২৯৬] *সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫*

[২৯৭] *সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫*

[২৯৮] *সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬*

[২৯৯] *বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭)*

[৩০০] *সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর প্রাথমিক জীবন

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়জন ইসলামী চিন্তাবিদ, দক্ষ রাজনীতিক, ক্ষুরধার লেখক, অসাধারণ বাগ্মী ও সমাজ হিতৈষী সংস্কারক বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যকাশে ধ্রুপ তারার ন্যয় দীপ্তিমান তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী অন্যতম। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও আকাইদের সূক্ষ পণ্ডিত, অন্যদিকে ছিলেন বহু ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন এবং ইতিহাস, সাাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের একজন খ্যাতিমান সাধক। ১৯৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের মুসলমানদের যে করুণ পরিণতি দেখা দেয় তা হতে মুসলমানদের উদ্ধার করে পুনর্জীবন দানে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর ভূমিকা ছিল গুরূতপূর্ণ। ইংরেজী ১৮৮৮ সালের মে, বাংলা ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আপন মাতুলালয় বর্ধমান জেলার রসূলপুর পরগনার টুবগ্রামে আব্দুল্লাহিল বাকীর জন্ম।[৩০১] তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী।[৩০২]

বংশ পরিচয়

আব্দুল্লাহিল বাকীর পিতার নাম আল্লামা সৈয়দ আব্দুল হাদী। তার পিতামহ সৈয়দ রাহাত আলী এবং প্রপিতামহ সৈয়দ বাকের আলী। এদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরীর অধিবাসী। এরা ছিলেন কুরাইশ বংশসম্ভুত।[৩০৩]

---

[৩০১] *তর্জুমানুল হাদীস- ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা*

[৩০২] *আব্দুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, আল্লামা আব্দুল্লাহিল বাকী (রহ) - সংক্ষিপ্ত জীবনী, পৃ:১*

[৩০৩] *ড. মু: আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ১৮০১-১৮৭১, ই.ফা.বা. প্রথম প্রকাশ, জুলাই-১৯৮৬, পৃঃ ২৫৯*

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আদম-বারহা লস্কর নামে এক ব্যক্তি পারস্য থেকে হায়দ্রাবাদে নিবাস স্থাপন করেন। তারপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০২ সালে ইসলাম খান বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলে তাঁর অন্যতম সেনাপতি হিসাবে চট্টগ্রাম আসেন এবং মগ দস্যুদের দমনের কাজে সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই চট্টগ্রামের সুলতানপুরে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। বড় আদম লস্কর নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ আদমের মাজার এখনও সেখানে আছে। সৈয়দ আদমের তিন ছেলে, সৈয়দ নসরত আলী, সৈয়দ ফরহাদ আলী ও সৈয়দ রিজা আলী। সৈয়দ নসরত আলী এগারো বছর বয়সে মারা যান। এবং ফরহাদ আলী এগারো বছর বয়সে বিদ্রোহ করে আরাকানে পালিয়ে যান। তৃতীয় ছেলে সৈয়দ রিজা আলী ইসলাম খানের মেয়েকে বিয়ে করেন। এই রিজা আলীর পঞ্চম সন্তান সৈয়দ রাহাত আলীই সৈয়দ আব্দুল হাদীর পিতা, আব্দুল্লাহিল বাকীর ছিলেন পিতামহ। নিম্নে তাঁদের বংশ তালিকা 'শেজারা নামা' দেওয়া হলঃ

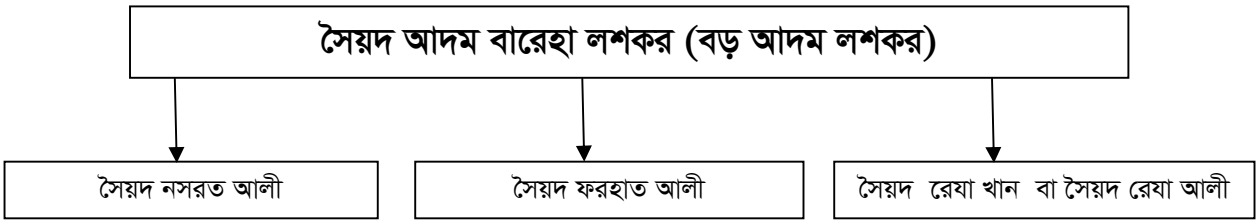

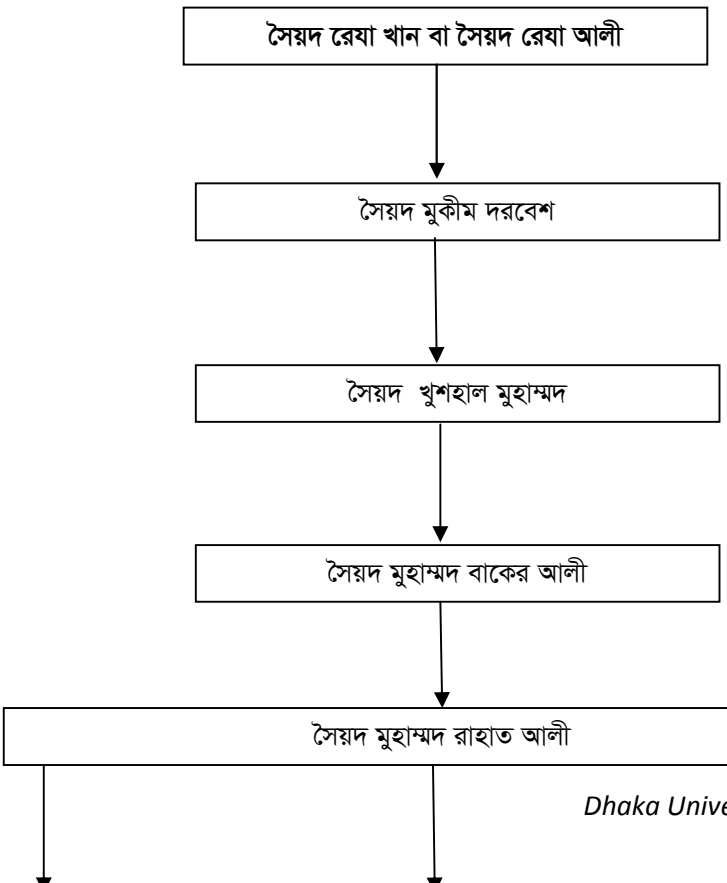

Dhaka University Institutional Repository

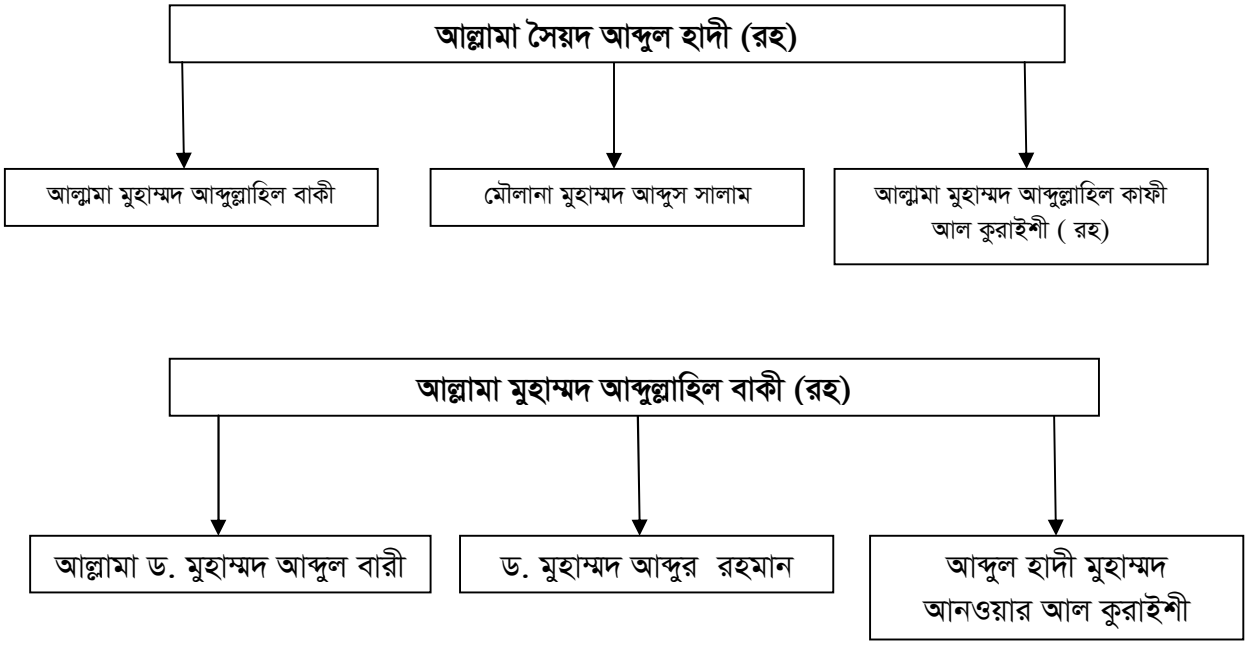

চট্টগ্রামের সুলতানপুরে মাওলানা হাদীর জন্ম হয়। নিজগৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর চট্টগ্রাম শহরের মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি দিল্লিতে গমন করেন হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যায়ন করার জন্য। দিল্লিতে তিনি বিখ্যাত কামেল হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট উসতায আহলে হাদীস প্রবক্তা সৈয়দ নাযীর হোসাইন দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) নিকট 'সিহাহ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে তিনি একনিষ্ঠ ও বিপ্লবী আহলে হাদীস হিসেবে নিজগৃহে ফিরে আসেন। কঠোর আহলে হাদীস মতবাদের জন্য তাঁকে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, এমনকি স্বীয় মাতৃভূমি চট্টগ্রাম ত্যাগ করে হুগলী মাদরাসায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত তাঁর চাচার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।[৩০৪] হানাফী মাযহাবের প্রবীণ শিক্ষাবিদ তার এই জ্ঞাতি চাচা মাওলানা আব্দুল কাদির সৈয়দ

[৩০৪] *আরাফাত, ঢাকা, ৩ মে, ১৯৬৬*

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হাদীর সাথে তার বিদূষী কন্যাকে বিয়ে দেন। সেখানে শ্বশুরের প্রচেষ্টায় সৈয়দ আব্দুল হাদীর প্রথমে হুগলী স্কুলে পরে হুগলী মাদরাসায় শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ হয়।[৩০৫]

ধর্মক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের মতবাদ পোষণ করার ফলে শ্বশুরের সংগে অচিরেই তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। কিন্তু কন্যা এবং জামাতার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভাব দেখে অবশেষে আব্দুল কাদির তাঁর ক্রোধ অবদমিত করেন। সামান্য কিছুদিন দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরই আব্দুল কাদিরের কন্যা মৃত্যুবরণ করেন। কন্যার মৃত্যুর পর সৈয়দ আব্দুল হাদীর সাথে চাচা আব্দুল কাদিরের বিরোধ গাঢ় হয়ে উঠে। এর পরিণামে তাকে মাদ্রাসার চাকুরী হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে বেকার হয়ে পড়তে হয়।[৩০৬]

হুগলীতে টিকতে না পেরে আব্দুল হাদী বর্ধমানে রসুলপুর পরগনার টুবগ্রামে পৌছান। সেখানে বসবাসের অল্পকাল পরই তিনি স্থানীয় শাহ খুররম হুসেনের বংশধর গদ্দীনশীল পীর শাহ দিরাসাতুল্লাহর পৌত্রী উম্মে সালমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই উম্মে সালমার গর্ভেই সৈয়দ আব্দুল হাদীর পাঁচ সন্তান, আব্দুল্লাহিল কাফী, আব্দুল্লাহিল বাকী, সফিয়া, ফাতিমা, হাবীবার জন্ম হয়।[৩০৭] এখানেও তাঁকে আহলে হাদীস মতবাদের জন্য অনেকের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়।[৩০৮] অনন্যোপায় হয়ে মাওলানা হাদী রংপুরের লালবাড়ি পরগনার বখশীগঞ্জে এসে বসতি সাথাপন করেন। এই পরিবেশটি তার মতবাদ প্রচারের উপযোগী ছিল। প্রথমে তিনি ফুলবাড়ীতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন। পরে বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত লালবাড়িতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে সেখানে আরবী, সাহিত্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিতে থাকেন। অন্যদিকে তার প্রচেষ্টায় উত্তর বঙ্গের আহলে হাদীসের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময় তাকে এ অঞ্চলের আহলে হাদীস জামাআতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়।[৩০৯]

তিনি সেখানে সবার জনপ্রিয় হয়ে যান। এদিকে লালবাড়ীর জমিদাররের সঙ্গে ধর্মীয় মতপার্থক্য প্রচন্ডরূপ ধারণ করলে তাঁর সেখানে থাকা সম্ভবপর হয়নি। তার ভক্ত ও অনুসারীরা সেখান থেকে

---

[৩০৫] *সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ:১০*

[৩০৬] *সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০,১১)*

[৩০৭] *সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রাগুক্ত,পৃ:১১)*

[৩০৮] *আরাফাত, ঢাকা, ৩০ শে মে, ১৯৬৬*

[৩০৯] *আরাফাত, ঢাকা, ৩০ শে মে, ১৯৬৬*

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ মাইল দূরে 'বস্তির আড়া' নামক স্থানে তাকে নিয়ে যায়। এখানেই তিনি তার জীবনের বাকী দিনগুলো কাটান।[৩১০]

এ স্থানটি পরবর্তী সময় তার হাদী নামের সাথে মিল রেখে 'নূরুল হুদা' নামে অভিহিত হয়। তার বখশীগঞ্জের মাদরাসাটি নূরুল হুদায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে বহু লোক মাওলানা হাদীর নিকট কুরআন হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কালক্রমে মাদ্রাসাটি নিউস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসায়, অতঃপর হাই স্কুলে পরিণত হয়।[৩১১]

১৯০৬ সালে মাওলানা হাদী ইন্তিকাল করেন। হাদীস তাফসীরে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার এবং সমাজ জীবনে এর বাস্তবায়নে তার একান্ত আগ্রহ ছিল। ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর কতিপয় পাণ্ডলিপি উত্তরসুরীদের কাছে সংরক্ষিত আছে।[৩১২] তিনি একজন ভাল আরবীবিদ ছিলেন বলে জানা যায়।[৩১৩] মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী অপেক্ষা ১২ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী-(১৯০০-১৯৬০)। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যেসব মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলমানদেরকে ধর্মীয় প্রেরণা, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তম্মধ্যে মাওলানা কাফীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, কর্মানুরাগী ও সংগঠনিক শক্তির অধিকারী। তিনি ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি উপমহাদেশের প্রথিত যশা আলেম ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৯৮৮-১৯৫৮) স্নেহ স্পর্শে এসে বাগ্মীতায় ও লেখনীতে অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি মাওলানা আবু কালাম আযাদের আল হেলাল (১৯১২-১৪) 'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৬) এবং মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দু দৈনিক যমানায় সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯২২ সালে মাওলানা কাফী 'জমিয়তে উলামায়ে বাংগালার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৩১৪]

---

[৩১০] *সৈয়দা সাবেরা মাসউদ, আমাদের তিন পুরুষের ঐতিহ্যময় গৌরবময় জীবন কাহিনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ: ৪*

[৩১১] *আরাফাত, ঢাকা, ৩০ শে মে, ১৯৬৬*

[৩১২] *আরাফাত, ঢাকা, ৩০ শে মে,১৯৬৬*

[৩১৩] *ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ- ১৮০১-১১৭১, ই.ফা.বা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৬, পৃ:২৬০*

[৩১৪] *সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী; ১৯০০-১৯৬০ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ:১৫*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কাফীর পরিচালনা ও সম্পাদনায় ১৯২৪ সালে কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারীরূপে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টির সেক্রেটারী' নির্বাচিত হন।[৩১৫] মাওলানা কাফী ১৯৩০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে একাধিকবার কারাবরণ করেন।[৩১৬]

কর্মজীবনের শেষভাগে তিনি আহলে হাদীস জামাআতের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং ১৯৫৭ সালে সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৩১৭] তিনি একজন মহৎ আলিমও ছিলেন। ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। আরবী ও উর্দু ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি উর্দু এবং আরবী ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলন। [৩১৮]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী মাতৃকুলে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলাধীন রসুলপুর পরগনার টুবগ্রাম নিবাসী পীর শাহ দিরাসতুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। এই পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর বংশধর বলে পরিচিত। মাওলানার মাতা উম্মে সালমা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। ফুরফুরার পীর আবু বকর ছিদ্দিকও একই বংশোদ্ভূত।[৩১৯]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মাতা উম্মে সালমা অতিশয় ধর্মপরায়ণা ও বিদূষী নারী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী সৈয়দ আব্দুল হাদীর শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক কাজে পুণ্যবতী স্ত্রী হিসেবে গৃহভ্যন্তর থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লালবাড়ী ও নূরুলহুদাতে মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাদী যে দুটো মাদরাসা পরিচালনা করেছেন, সেগুলোর ছাত্রাবাসের ছাত্রদের রান্নাবান্নার বাবুর্চী হিসেবেও তিনি সাধ্যপক্ষে সেবা দিয়ে গেছেন। তিনি উর্দু ভাষা ও বাংলাতে বইপত্র পড়তে ও

---

[৩১৫] *আরাফাত, ঢাকা, ৩০ শে মে, ১৯৬৬*

[৩১৬] *সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী; ১৯০০-১৯৬০ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ:১৬,১৭*

[৩১৭] *মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, আহলে হাদীস আন্দোলন, পি.এস.ডি. থিসিস, হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬*

[৩১৮] *ড. মু: আব্দুল্লাহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ই.ফা.বা. প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ জুলই:১৯৮৬, পৃ:২৬৫*

[৩১৯] *মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গলিব, আহলে হাদীস আন্দোলন, পি,এস,ডি থিসিস, হা,ফা,বা, কাজলা, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬*

Dhaka University Institutional Repository

চিঠিপত্র লিখতে পারতেন।[৩২০] তার পুণ্যময় সংস্পর্শে অনেক মহিলা কুরআন তিলাওয়াত, সূচীশিল্প ও রান্নাবাড়ায় সুনিপুণা হয়ে উঠেছিলেন।[৩২১] তার পবিত্র চরিত্র সুষমার কারণে তিনি স্বামী সৈয়দ হাদীর ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর কাছে আম্মাজী খেতাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।[৩২২]

শৈশব ও শিক্ষা জীবন

আবদুল্লাহিল বাকীর শৈশবের শুরুর বছরগুলো কাটে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানাধীন পিতা সৈয়দ মাওলানা আবদুল হাদীর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ লালবাড়ী মাদরাসাকে ঘিরে। সেখানে তিনি পিতামাতার স্নেহের দৃষ্টির সীমানায় এবং মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলী ও পিতার ভক্তকুলের আদর মমতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বিদূষী মাতা উম্মে সালমার কাছে। শৈশবে তিনি লালবাড়ী মাদরাসায় আবদুল ওয়াহাব নাবীনা দেহলভীর নিকট এবং পিতার সান্নিধ্যে বাল্য শিক্ষা লাভ করেন।উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আগে তিনি লালবাড়ী মাদ্রাসায় অন্যান্য যশস্বী আালিমগণের নিকট থেকেও আরবী, ফার্সি ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন।[৩২৩]

এরপর তিনি ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উত্তর ভারতের কানপুরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ জামেউল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[৩২৪]সেখানে প্রায় ১০ বছর ধরে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসুল,

---

[৩২০] *আল্লামা সৈয়দ আব্দুল হাদী আল কুরাইশী (রহ), আব্দুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার আল কুরাইশী, আমার দাদাজী, নূরুল হুদা প্রকাশনী- দিনাজপুর প্রথম সংস্করণঃ মে, ২০০৭ইং, পৃ:১০*

[৩২১] *প্রাগুক্ত, পৃ: ১০*

[৩২২] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৯*

[৩২৩] *আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, আল্লামা আবদুল্লাহিল বাকী (রহ) সংক্ষিপ্ত জীবনী, দিনাজপুর, প্রথম সংস্করণ ২০০৬ ইং, পৃঃ ১*

[৩২৪] *আরাফাত, ঢাকা, ২০শে জুন ১৯৯৬*

Dhaka University Institutional Repository

মান্তেক, ইতিহাস, দর্শন ও রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন ও বুৎপত্তি লাভ করেন। ঐসময় তিনি ১৫ পারা কুরআন মাজীদ ও মুখস্ত করেন।[৩২৫]

১৯০৬ সালে পিতার অসুখের কথা শুনে তিনি তাঁর সেবার জন্য চলে আসেন। ঐ সালেই পিতা আল্লামা আবদুল হাদী ইন্তিকাল করলে মাত্র আঠার বছর বয়সে তার কাঁধে সংসারের দায়িত্ব এসে চাপে। ১৯০৮ সালে মায়ের ইচ্ছায় মামা মুন্সী সুজাত আলীর কন্যা জাহারা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুর নিবাসী মাওলানা সাইফুল্লাহ (রহ) এর কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা সফুরা খাতুনের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময় তাঁর বয়স প্রায় ২৬ বছর।[৩২৬]

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা বাকীর কর্মজীবন

ইসলাম প্রচার

১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পলাশীর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক,সাংস্কৃতিক,আর্থনীতিক ও ধর্মীয় পতনের যে সূচনা ঘটেছিল তা উত্তোরণের জন্য এ দেশের মুসলমানদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে যারা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন অন্যতম। নানাবিধ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামকে আপন মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ভাবাবেগ থেকেই তার সার্বিক কর্মকাণ্ড উৎসারিত ছিল। কুরআন ও

[৩২৫] *আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, পূর্বোক্ত পৃ: ১*

[৩২৬] *আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ১*

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের মাপকাঠিতে ওজন করেই তিনি প্রতিটি কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিবেদিত ইসলাম প্রচারক।

ইসলামের মূল আদর্শ থেকে মুসলমানদের সরে যাওয়া এবং ইসলামে ধর্মের নামে নানাবিধ অধর্ম ও কুসংস্কার, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও ফিরকাবন্দী তাঁকে যারপর নেই বিচলিত করে তুলে। তৎকালীন সময়ে বাংলার মুসলমানদের শোচনীয় আবস্থা দেখে তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে, "বাংলার আলিম সমাজ ও মুসলিম জনগণের জড়তা ও দুর্দশা দর্শনে তাঁহার আত্মা ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই তিনি তদানীন্তন দেশ বরেণ্য আলিম ও নেতা মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগীতায় 'আঞ্জুমান উলামায়ে বাঙালার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ইহার কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।"[৩২৭]

'আঞ্জুমানে-এ-্উলমায়ে-এ' বাংলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মাসিক মুহাম্মদীতে বলা হয়েছে, "তাঁর উদ্যোগে এবং মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগিতায় ১৯১০ সালে বগুড়া জেলার বালিয়া গ্রামে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ সুনীল কান্তি দে বলেন,

"তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানদান, ইসলামী রীতিনীতি চর্চা, ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সমাজকে অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালানোই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালার অন্যতম পদক্ষেপ ছিল 'ইসলামী মিশন' বা ধর্ম প্রচার। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার , ভিন্নধর্মী প্রচারক দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহকে খণ্ডন করে পুস্তক রচনা, সারা বাংলা, রেঙ্গুন ও আসামের উপজাতীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচার করাই ছিল এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।"[৩২৮]

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালা প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজকে পুনগর্ঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা এবং আসাম প্রদেশের বিভিন্ন

---

[৩২৭] *ড. মহাম্মদ আদম উদ্দিন, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃঃ ৬৩*

[৩২৮] *ডঃ সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২-৩*

Dhaka University Institutional Repository

জেলা ও মহকুমায় সংগঠনের শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়। এই সংস্থার মুখপত্র ছিল আল-এসলাম।' ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ ও ফিচার প্রকাশ-প্রচার করতো পত্রিকাটি। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সভা-সেমিনার করে এ সংস্থা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করে।

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

১. ইসলাম প্রচার ঃ অর্থাৎ ধর্ম জ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ দৃঢ় করার জন্য ধর্ম সম্পর্কে যে সব অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসন করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলমানরূপে প্রতিষ্ঠা করা;

২. গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারা অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, মাহাত্ম্য ও সভ্যতা প্রচার করে তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা;

৩. খ্রিষ্টান, আর্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে প্রচারিত ইসলাম ধর্ম, কুরআন শরীফ ও রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা, ঘৃণিত ও কঠোর আক্রমণ পূর্ণ পুস্তক-সমূহের প্রতিবাদ প্রকাশ করে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা;

৪. মুসলমানদের মধ্য থেকে আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, মামলা, মোকদ্দমা প্রভৃতি নিবারণ পূর্বক সকলের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করা। এতদুদ্দেশে জায়গায় জায়গায় শালিশী বোর্ড গঠন করা;

৫. প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত আলিমদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভূগোল-ইতিহাস, ইংরেজি-বাংলা প্রভৃতি ভাষা এবং ধর্ম প্রচার ও ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক তর্ক-পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া, ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত ধর্মানুরাগী মুসলিম যুবকদেরকে উপযুক্ত রূপে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে একদল সময়োপযোগী প্রচারক তৈরি করা;

৬. ইসলাম ধর্ম, মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস, কুরঅন, হাদীস, ফিকাহ, আকায়েদ, কালাম, প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেবাংলা ভাষায় একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এ সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচারনা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা, মুসলমান সমাজ থেকে শিরক-বিদআত ও কুপ্রথাসমূহ এবং অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করাই ছিল মাওলানার মুখ্য উদ্দেশ্য।[৩২৯]

আঞ্জুমানের জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মিশনের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ইসলাম ও মিশন' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেনঃ

"দেশের যে যে স্থানে স্ত্রী পুরুষেরা পীরের দরগাহে যাইয়া ও জীবিত পীরের নিকট যাইয়া বর্ণিতরূপে শিরক বিদআত রূপে মহাপাপ অর্জন করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ কুপথ থেকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ঈমানদার ভ্রাতৃগণ একতাসুত্রে আবদ্ধ হইয়া এসকল কুপ্রথা উঠাইয়া দেউন। কবরে, দরগাহে, মাযারে বাতি জ্বালান, মানত চড়ান সমূহ বিনাশ করা আবশ্যক। দেশের আলিম, ফাজেল, মুনশী সরদার সকলেই এই মহাপাপের বীজ উৎখাত করার জন্য বদ্ধ পরিকর হউন।"[৩৩০]

সোনালী যুগের আদর্শকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই মাওলানা আঞ্জুমানের কর্মীবাহিনী দ্বারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কর্মসূচীগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক শাসন দ্বারা মুসলমানদেরকে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত উত্যাদি ধর্ম কর্মের প্রতি আকর্ষণ করা।

২. মুসলমানদের কুসীদজীবি মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বিনা সুদে কর্জ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে বা এক কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উপায়ে একটি ধর্মগোলা স্থাপন করা -

ক. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কৃষক ধান্যাদি গোলাজাত করার পূর্বে অবস্থানুযায়ী তাদের নিকট হতে কিছু কিছু চাঁদা স্বরূপ ধান্যাদি ধর্মগোলায় জমা করা;

খ. সুপারি, নারিকেল, লঙ্কা-মরিচ, খেশারী, মুগ, তামাক, পাট, সরিষা, রাই, তিষি ইত্যাদি ফসল কিছু কিছু গৃহস্থ হতে সংগ্রহ করে বিক্রয়লব্ধ মূল্য বিশ্বাসী আমানতদার ক্যাশিয়ার এর নিকট গচ্ছিত রাখা;

---

[৩২৯] *মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৫৮-১৬০*

[৩৩০] *মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৬৩-১৬৪*

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রত্যেক ধর্মগোলার কর্তব্যকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে এক একটি কমিটি গঠন করে বিশ্বাসী আমানতদার ব্যাক্তির বাড়িতে ধর্মগোলার হিসাব-নিকাশ স্বতন্ত্র সেক্রেটারির নিকট রাখা;

৩. স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সমভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বালকদের ন্যয় বালিকাদের জন্যও কুরআন শরীফ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

৪. সবল, কার্যক্ষম ও অবস্থাপন্ন ভিক্ষা-ব্যবসায়ীকে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা নিবারণ করা।

ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও মর্মবাণীকে মুসলিম জাগরণের ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালার মাধ্যমে উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সংগঠনটি মূলত ছিল শরিয়তপন্থী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা বাংলার বিভিন্ন মতাবাদের অনুসারী ওলামা সমাজকে একই মঞ্চে একত্রিত করে মুসলিম মিল্লাতের সেবায় নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সংস্থাটি মুসলমানদের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামীক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। আঞ্জুমান মুসলিম সমাজকে সুসংহত করতে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলমী রীতিনীতি অনুসরণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে আধুকি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এছাড়া অমুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, মাহাত্ম্য, সভ্যতা প্রচারেও সচেষ্ট ছিল।[৩৩১]

'আঞ্জুমান-এ ওলামা-এ -বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল হানাফী ও আহালে হাদীস আলেমগণকে এক মঞ্চে এনে তাদের মধ্যকার ধর্মীয় বিভেদ দূর করা এবং মুসলমানগণকে তাদের ধর্মীয় সামাজিক অবস্থান ও সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।[৩৩২] আঞ্জুমান এর মুখপাত্র 'আল-এসলাম' (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলিম সমাজের জাগরণ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৩৩]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ইসলাম প্রচারে ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা পোষণ করতেন। তিনি প্রচলিত ধারার কোন পেশাদার ওয়ায়েজ (বক্তা) হতে চান নি। তবে তার সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত

---

[৩৩১] *মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫-১৬৭*

[৩৩২] *মাসিক মুহাম্মদী, ৩৫ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭১ পৃঃ, ৮৭৯*

[৩৩৩] *ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ , রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭, ৩য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ পৃঃ ১৪৪*

Dhaka University Institutional Repository

শ্রোতামাত্রকেই বিমোহিত করত। তিনি কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন বলে তার ধর্মীয় আলোচনার সারবস্তু ছিল তত্ত্ব ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ।

একটি সাক্ষাৎকার

ইসলাম প্রচারে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর বিশেষ স্বকিয়তা এবং কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তার ছোট ছেলে অবঃ স্কুল হেড মাস্টার আব্দুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার নিম্নক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন-

প্রশ্নঃ আপনার পিতা মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী প্রচলিত ধারার ধর্ম সভাগুলোতে যোগদান করতেন কিনা?

আব্দুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার ঃ আমার পিতা উচ্চ শিক্ষিত আলেম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কোন ধর্ম সভায় (ওয়াজ মাহাফিল) বক্তৃতা করতেন না। তিনি বরং ইসলামী আন্দোলন মূলক সভাগুলেতে তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী বক্তৃতা করতেন।

প্রশ্নঃ আপনার শ্রদ্ধেয় পিতার ধর্মীয় দাওয়াতি এলাকার পরিধি কি ছিল?

আব্দুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার ঃ আমার পিতাজী মূলত আমার দাদাজীর আবাদকৃত এলাকাগুলোতে সফরে যেতেন। বিশেষ করে সে এলাকাগুলো ছিল রংপুরের হারাগাছ, গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের আরও বেশ কিছু এলাকা।

প্রশ্নঃ আপনার শ্রদ্ধেয় পিতার ছাত্র ও শিষ্য মণ্ডলী তাকে পীর হিসাবে মনে করতেন কিনা?

আব্দুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার ঃ আমার পিতাজী লোকজনকে হাতে কলমে ঈমাণ আকীদাহ শিক্ষা দিতেন। সমাজে সর্বত্র নামায কায়েমে জোর দিতেন। প্রচলিত অর্থে পীরবাদকে ঘৃণা করতেন এবং নিজে কখনও পীর হতে চান নি। তিনি তার ছাত্র ও ভক্তগণ কর্তৃক 'বড় মাওলানা' হিসাবে অবহিত হতেন। এবং তার অনুজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী ছোট মাওলানা বলে অবহিত হতেন। (সাক্ষাতকার গ্রহণঃ ১৪/০৬/১৪ তাং সকাল ৮ ঘটিকা)।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কখনও কোন ধর্ম সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করলে শ্রোতা মন্ডলী বিমোহিত না হয়ে পারতেন না। তিনি ১৯০৭ সালে গাইবান্ধার খোলাহাটিস্থ প্রসিদ্ধ ফারসী বন্দরে এক বিরাট সভায় যোগদান করেন এবং বক্তৃতা করে সকলকে বিমোহিত করেন।[৩৩৪]

তিনি মনে করতেন ইসলাম প্রচারে মাদরাসাগুলোর ব্যপক ভূমিকা রয়েছে। সেজন্য তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অশেষ গুরুত্ব দিতেন। গাইবান্ধা জেলার প্রসিদ্ধ মহিমা গঞ্জের কামিল মাদরাসাটি তার অনন্য কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

সমাজ হিতৈষী মাওলানা বাকী

[৩৩৪] *আব্দুল হাদী মোহাম্মদ আনওয়ার, পূর্বোক্ত পৃঃনংঃ ২০২*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন অন্তপ্রাণ সমাজকর্মী। এ গুণাবলী অনেকাংশেই তিনি তার পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের মহৎ কর্মের আলোচনায় মাসিক তজুমানুল হাদীস লেখা হয়েছে।

"মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী তাহার বুজর্গ পিতার অনেক গুণই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। বিদ্যাবক্তা, ধর্মপরায়নতা ও সমাজ সেবার প্রেরণা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।"[৩৩৫]

বস্তুত ইসলাম সমাজ ও মানবসেবাকে অশেষ পূন্যকর্ম ও আল্লাহর ইবাদত বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল কুরআনে মহান আল্লাহর বাণী এ ব্যপারে অনেক উৎসাহ ব্যঞ্জক,"তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, তাতে তোমরা সফলকাম হবে"।[৩৩৬]

ইসলাম নিঃস্ব, নিরন্ন ও বঞ্চিতজনকে সেবার নির্দেশ দিয়ে বলেছে,"তুমি কি তাদের দেখেছ যারা কিয়ামতের প্রতিফলকে মিথ্যা মনে করে? তারা হল ঐ সব লোক, যারা ইয়াতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিয়ে উৎসাহ দেয় না।"[৩৩৭]

"অতএব তুমি এতিমদের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর না এবং যাঞ্চাকারীকে ধমক দিয়ো না।"[৩৩৮]

হাদীস শরীফে মহানবী (সাঃ) এর বাণীও এ ব্যপারে অনুপ্রেরণামূলক।

সাহল বিন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- "আমি ঐ এতিমের লালন পালনকারী বেহেশতে এভাবে একত্র থাকব এই বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দুটোর মাঝখানে ফাঁক করলেন।"[৩৩৯]

অপর হাদীসে নবী (সাঃ) বলেন, "বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকিনদের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।... তিনি একথাও বলেছেনঃ সে অবিরাম নামায আদায়কারী এবং অব্যহত রোজাপালনকারীর সমতুল্য।"[৩৪০]

---

[৩৩৫] *তর্জুমানুল হাদীস মাসিক, তৃতীবর্ষ–১৩৫৮ -৫৯ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪৬৯*

[৩৩৬] *সূরা আল হজ্ব- ৭৭ নং আয়াত*

[৩৩৭] *সূরা আল মাউনঃ ১-৩ নং আয়াত*

[৩৩৮] *সূরা দোহাঃ ৯,১০ নং আয়াত*

[৩৩৯] *সহীহ বুখারী, মিশকাত, পৃ:নং: ৪২২*

[৩৪০] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃ:নং: ৪২১, ৪২২*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবার ধারণা অতি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত হাদীস থেকে। আনাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন," যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপন করে অথবা কোন ফসল বুনে; আর তা হতে কোন মানুষ, পাখি অথবা জীব জন্তু খেয়ে নেয়, তা তার জন্য সদকা(দান) স্বরূপ হবে।"[৩৪১]

মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে লেখা হয়েছে, "তাহার প্রত্যেকটি কাজের ভিতর ধর্ম প্রবনতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত।"[৩৪২]

ধর্মভাবে উদ্বেলিত হয়ে তিনি সমাজ ও মানব সেবায় সদা নিবেদিত ছিলেন। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে লেখা হয়েছে," আপামর জনসাধারণের জন্য তাহার দয়ার্দ্র হৃদয় সর্বদায়ই কাদিয়া উঠিত। প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সদোপায়ে সাহায্য করিতে তিনি ছিলেন সদা উন্মুখ। বস্তুত কত লোক কত ভাবে যে এই কল্যাণকামী আদর্শ কর্মী দ্বারা কত বিচিত্র উপায়ে উপকৃত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?"[৩৪৩]

সে কালে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা যখন কঠিন ও দূরাশার বিষয় ছিল, প্রতি বছর অসংখ্য লোক কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, যক্ষা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত, শহুরে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত দূর্গম অজপাড়াগাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই যখন ছিল না, ঠিক এমন সময় সমাজ দরদী মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজেদের জমির উপর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রটি বর্তমানে সরকারের আনুকুল্যে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র হিসাবে জনগনের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমাজ হিতৈষী মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী জনগণের প্রয়োজন বিবেচনা করে তাদের একান্ত দরকারী সংবাদাদি সহজে আদান প্রদানের জন্য সে সময়ের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে নিজ গ্রামে নিজেদের জমিতে একটি ডাকঘর স্থাপন করেন। ডাকঘরটির কার্যক্রম এখনো অব্যাহতভাবে চলছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র সহজ উপায় হিসাবে তৎকালে রেল গাড়ির যোগাযোগই ছিল মূল। আব্দুল্লাহিল বাকী তার এলাকার মানুষের বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পার্বতীপুর খোলাহাটি রেল-স্টেশনটি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

---

[৩৪১] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃ:নং: ১৬৮*

[৩৪২] *তর্জুমানুল হাদীছ, ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৬৯*

[৩৪৩] *তর্জুমানুল হাদীছ, ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৬৯*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর পিতা আলাম্মা সৈয়দ আব্দুল হাদীর প্রতিষ্ঠিত নূরুলহুদা মাদরাসাটি দরসে নিযামিয়া বা কাওমী ধারার নিরেট কুরআন হাদীস ও আরবী সাহিত্যের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল। সময়ের প্রয়োজনে সরকারের আর্থানুকুল্য লাভ করতে ও মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সমাজে মাথা উচু করে যেন দাঁড়াতে পারে সেই লক্ষকে সামনে নিয়ে আব্দুল্লাহিল বাকী মাদরাসাটিকে ১৯১৫ সালে জুনিয়ার মাদরাসায় রূপান্তর করেন। অতপর তিনি ১৯২১ সালে সরকার কর্তৃক পরিগৃহীত নিউস্কীম মাদরাসা সমূহের আওতাধীন করলেন। ১৯৫০ সালে তিনি এটিকে সিনিয়র মাদ্রাসায় রূপদেন। মাদ্রাসাটি ১৯৬৫ সালে হাইস্কুলে পরিণত হয়ে অধ্যবধি সুনামের সাথে শিক্ষার আলো বিতরণ করে যাচ্ছে।

দিনাজপুরের কৃতি সন্তান রবীন্দ্র নারায়ন ঘোষ যিনি ছিলেন কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় কলকাতাস্থ তদানিন্তন রিপন কলেজের শাখা হিসাবে ১৯৪২ সালে দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুলে সুরেন্দ্রণাথ কলেজ (এস এন কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয়দের মধ্যে এর প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী । সেই কলেজটি বর্তমানে দিনাজপুর সরকারী কলেজ ।[৩৪৪]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর উদ্যোগে আহুত ১৯২২ সালের আঞ্জুমান-এ-উলামা-ই বাঙ্গালার কনফারেন্সই মহিমাগঞ্জে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজ প্রসিদ্ধ মহিমাগঞ্জ আলিয়া(কামিল) মাদ্রাসা (গাইবান্ধা) নামে পরিচিত।[৩৪৫]

[৩৪৪] *কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও মাওলানা বাকীর পারিবারিক ইতিহাস থেকে সংগৃহীত*

[৩৪৫] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২, ড. আব্দুল হক পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪*

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা আকস্মিক কোন ঘটনা জনিত কারনে, সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য কিংবা সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের মোহে পড়ে ছিলনা। বরং তা ছিল অনেকটা উত্তরাধিকার লব্ধ চেতনাধর্মী স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য আত্মনিবেদন স্পৃহা সঞ্চাত। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে তার জীবনাল্লেখে লিখা হয়েছে,

"....মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী উহার বুজুর্গ পিতার অনেক গুণই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। বিদ্যাবত্তা, ধর্মপরায়নতা ও সমাজ সেবার প্রেরনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সমাপনের পর বেশ অল্প বয়সেই তিনি সক্রিয়ভাবে দেশ সেবা ও রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকেন"।[৩৪৬]

পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়েছে, "তিনি ছিলেন ইছলামগত প্রাণ। ইছলামের দুর্দশায় তাঁহার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিত। আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙালার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে,"বাংলার মুসলিম সমাজ ও মুসলিম জনগণের জড়তা দুর্দশা দর্শনে তাঁহার আত্মা ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই তদানিন্তন দেশ বরেণ্য আলেম ও নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগিতায় আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙালার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ইহার কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ সুনীল কান্তি দে লিখেছেন,

"ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধ, কানপুর মসজিদের হাঙ্গামা (১৯১৩ খৃঃ), খৃষ্টান মিশনারীদের খৃষ্ট ধর্ম প্রচার, ইসলামের উপর তাদের কলংক লেপন ইত্যাদি কারণে বাংলার আলিম সমাজ যেমন রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেন, তেমনি স্বজাতির নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন পূর্বক ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর (১৮৮৬-১৯৫২ খ্রী) উদ্যোগে ১৯১৩ সালে ১৫-১৭ মার্চে বগুড়া জেলার বানিয়া পাড়া গ্রামে

[৩৪৬] *তর্জুমানুল হাদীস মাসিক তৃতীবর্ষ–১৩৫৮ -৫৯ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪৬৯*

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী ও আহলে হাদীস 'আলিমদের এক পরামর্শ সভা আহবান করা হয় এবং ঐ সময় 'আঞ্জুমান-এ-উলামা' এ বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়।" [৩৪৭]

এই আঞ্জুমান এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৬১-১৯৬৮) তাঁর মাসিক মোহাম্মদীতে বলেনঃ

"আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছাহেবের মনে সর্ব প্রথম খেয়াল হলো যে, মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা আর আলেম সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শের উদ্দেশ্যে উভয় দলের (হানাফী ও আহলে হাদীস)আলেমদের একটি পরামর্শ সভা আহবান করা হোক। ফলে স্থানীয় আলেমবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বগুড়া জেলা বানিয়াপাড়া গ্রামে 'আঞ্জুমান-এ-উলামা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ....আমাকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে মোটামুটি কাজ আরম্ভ করা হয়।"[৩৪৮]

আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলার উদ্যোক্তা মাওলানা আবদল্লাহেল বাকী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এর সেক্রেটারী জেনারেল, যিনি এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ও ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ(১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন যথাক্রমে এর যুগ্ম সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক।

আঞ্জুমানের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আরও লিখেছেন, 'আঞ্জুমান এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরন অভিযানের সম্ভাব্য পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করা। কিন্তু বস্তুত এর একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় চরিত্র ছিল। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা, শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের উন্নত করে সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা।[৩৪৯]

কলকাতার ইংরেজী পত্রিকা হাবলুল মতিনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, "The Anjuman –i-Ulama-i- Bangla is not only a religious but a national institution, for its

[৩৪৭] *ডঃ সুনীল কান্তি দে ,কলিকাতা ১৯৯২, পৃঃ১৪-১৫*

[৩৪৮] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃঃ ৪৪*

[৩৪৯] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫*

Dhaka University Institutional Repository

labours will not only bring about a revival of the Islamic faith, but elevate the national character of the Bengalee."[৩৫০]

১৩২২ সালের বৈশাখ মুতাবিক ১৯১৫ সালের এপ্রিল মে মাসে 'আঞ্জুমান-এ- উলামা-এ-বাঙ্গালার মাসিক মুখপত্র 'আল এসলাম 'প্রকাশিত হয়। মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছিলেন এর সম্পাদক। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মাওলানা ফররোখ আহমদ নিযামপুরী ছিলেন সহ সম্পাদক। ...এ পত্রিকাটির উপাত্ত ছিল ধর্ম, মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও মাতৃভাষা বাংলার সেবা করা।[৩৫১]

অল ইসলাম পত্রিকার মান ও মননশীলতার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ লিখেছেন , "আল ইসলাম পত্রিকাটি ছিল নিঃসন্দেহে ইসলাম ধর্মীয় সাময়িকী সমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মাওলানা ফররোখ আহমদ নিয়ামপুরীর ন্যায় নামজাদা লেখকদের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, বাংলা ভাষা মুসলিম জাতির ইতিহাস, মুসলিম ব্যক্তিত্ব, ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক রচনা এতে প্রকাশিত হয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদ, মুসলিম ঐক্য , মুসলিম রাজনীতির বিকাশ সাধনে 'আঞ্জুমান -এ-উলামা-এ-বাংলা' ও এর মুখপাত্র 'আল ইসলাম' এর ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৩৫২]

কোরআন হাদীসের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। যে কোন আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন -এই মূল কথাটি কস্মিনকালেও ভুলে যাননি।[৩৫৩] বিশ শতকের গোড়ার দিকে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর জীবনে তারুণ্যের যখন নবজোয়ার, কর্মময় জীবনের যখন শুভ সূচনা, তখনি তিনি ঝাপিয়ে পড়েছিলেন দেশ ও স্বীয় মুসলিম সমাজের সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে। অপেক্ষাকৃত তরুণ আলেম ও ইসলাম প্রিয় বিদ্যানমণ্ডলীকে সাথে নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন 'আঞ্জুমানে ওলামায়া বাঙ্গালা'। তাদের মধ্যে

---

[৩৫০] *Hablul Matin, Calcutta 12 june, 1914, p.16 উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬*

[৩৫১] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ, ৪৭*

[৩৫২] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ৪৮*

[৩৫৩] *তর্জুমানুল হাদীস ,মাসিক, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৯*

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর)। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ধর্ম চিন্তা হলেও এর কর্মসূচিতে এমন কতিপয় ধারাকে সংযোজন করা হয়েছিল যাতে এদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে অধিকতর মজবুত করেছিল।

এর ধারাগুলোর মধ্যে ছিল ঃ

মুসলমানদের মধ্য থেকে আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নিবারণপূর্বক সকলের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করা। এতদুদ্দেশ্যে জায়গায় জায়গায় শালিসী বোর্ড গঠন করা; প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভূগোল-ইতিহাস,ইংরেজী-বাংলা প্রভৃতি ভাষা এবং ধর্ম প্রচার ও ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক তর্ক-পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া, ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মানুরাগী মুসলিম যুবকদেরকে উপযুক্তরুপে ধর্মশিক্ষা দিয়ে একদল সময়োপযোগী প্রচারক তৈরি করা; ইসলাম ধর্ম, মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস, কুরঅন, হাদীস, ফিকাহ,আকাইদ, কালাম প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।[৩৫৪]

অর্থনৈতিক ভাবে মুসলমানদেরকে কুসীদ জীবনের নিগ্রহ থেকে বাঁচাতে আঞ্জুমান প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম গোলা স্থাপন করে ধান, পাট, সরিষা,খেসারী,নারিকেল ইত্যাদি ফসলগুলো গোলাজাত করার মৌসুমে মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে কিছু কিছু শস্য জমা করে বিনা সুদে কর্জ দেয়ার জন্য আমানতদার ক্যাশিয়ারের নিকট গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সংস্থাটি মুসলমানদের মধ্যে একতা, জাতীয়তা ও ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়।[৩৫৫]

আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সংস্থা ইসলাম প্রচারে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৫৬]

সেখানে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ক সম্পর্কে পুস্তিকা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সভ্যতা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল থাকতো। প্রচারকগণ সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতো, বিশেষ করে ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগ ছিল। প্রচারকগণ প্রচারের সময় অন্যান্য ধর্মে

---

[৩৫৪] *আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৫, পৃঃ৫৫৪-৫৬*

[৩৫৫] *আঞ্জুমানেওলামায়ে বাঙ্গালা প্রাগুক্ত পৃঃ৭০*

[৩৫৬] *আঞ্জুমানে উলমায়ে বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২-২৩*

Dhaka University Institutional Repository

তুলনা মূলক আলোচনা করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন এবং অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন।[৩৫৭] আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙালার উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন কল্পে এর নেতাগণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। যদিও আঞ্জুমান স্বধর্মী ও বিধর্মী সব মহলেরই তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিল। মুসলিম সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দুরীভূত করে তাদের উন্নতির লক্ষ্যে আঞ্জুমানের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল। সে সময়ে ধর্মভিত্তিক এবং উলামাদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনও গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে "একথা সত্য, সংগঠনগুলোর মধ্যে 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙালা' যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে, অন্য কোন সংগঠনের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।[৩৫৮]

[৩৫৭] *আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক মোহাম্মাদি, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮৮৬-৮৮৭*

[৩৫৮] *আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর অবদান, প্রথম প্রকাশ-জুন ২০০৯, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃঃ ১৫৮*

Dhaka University Institutional Repository

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা বাকী

১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে তুরস্ক নিজের স্বার্থ রক্ষাকল্পে জার্মানীদের পক্ষ হয়ে বৃটিশ- ফ্রান্সের মিত্র শক্তির যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মহানবী সাঃ এর ইন্তিকালের (৬৩২ খ্রীঃ) পর আবু বকর রাঃ এর মাধ্যমে ইসলামে খেলাফতের সূচনা ঘটে। ইসলামী বিশ্বের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে খলীফার স্থান সবার উপরে বিবেচিত হতে থাকে। তিনি মুসলিম জাহানের ঐক্যের নিদর্শন। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা খলীফার কাছ থেকে স্বীকৃতি নিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে আইন সংগত করে নিত। খুৎবায়ে খলীফার নাম উল্লেখ করত। ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় খেলাফত বাগদাদ থেকে কায়রো হয়ে তখন ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত।[৩৫৯]

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) তুর্কী সুলতানের সাথে পত্র বিনিময় করেন এবং মক্কা- মদীনায় প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করেন।[৩৬০]

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের পর তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষায় বৃটিশ সরকার প্রধান ভূমিকা পালন করবে এই প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে।

"কিন্তু ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধ বন্ধের ঘোষনায় দেখা যায় তুরস্ককে প্রায় সম্পূর্ণভাবে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয় হয়েছে। পূর্বের আশঙ্কানুযায়ী দেখা যায় যে, তুরস্ক ও ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের গ্রেটবৃটেন তার প্রদত্ত ওয়াদা মোটেই রক্ষা করেনি।"[৩৬১]

"ইতি মধ্যে সেভার্স চুক্তির (Treaty of severs) শর্তাবলী প্রকাশিত এই চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের মনে এতে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[৩৬২]

---

[৩৫৯] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৯৩পৃঃ ১৪৯*

[৩৬০] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪৯*

[৩৬১] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০*

[৩৬২] *ডঃ মোঃ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২০*

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের খেলাফতের প্রতি ভারতের মুসলমানরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেই খেলাফত ছিল বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। যুদ্ধ শেষে বৃটিশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে তার নিজস্ব আবাসভূমি থেকে বঞ্চিত করে গ্রিসকে দেয়া হয় থ্রেস, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত এশীয় অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। "একজন হাইকমিশনারের মাধ্যমে মিত্রশক্তি পুরোপুরিভাবে তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করে এবং সুলতানকে একজন কয়েদীর ন্যায় ফেলে রাখে।[৩৬৩]

ভারতের বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা খেলাফতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে ও এর সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।মাওলানা মোহাম্মদ আলী, তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল আজাদের নেতৃত্বে বৃটিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা এবং সরকার বিরোধী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ সময়ে বোম্বাইয়ে ডঃ আনসারীর নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর 'খিলাফত দিবস ' পালিত হয়।[৩৬৪] বাংলায় ফজলুল হক ও মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন গড়ে উঠে।[৩৬৫] ২ শে নভেম্বর, ১৯১৯ দিল্লিতে বাংলার একে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খেলাফত কনফারান্সের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।[৩৬৬] ১৯২০ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জানাতে প্যারিস ও লন্ডন ভ্রমণ করেন। মিত্রশক্তি অথবা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কেউই এই ডেপুটেশনকে বিশেষ গুরুত্ব না দেয়ায় ডেপুটেশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এতে ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র ও জোরদার হয়।[৩৬৭]

১৯২০ সালে ১৯ মার্চ ভারতব্যাপী খিলাফতের দাবিতে হরতাল পালিত হয় এবং সারাদেশে একই সময়ে বহু খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯২০ সালে ১লা জুন এলাহাবাদে খিলাফত কমিটির আহবানে হিন্দু মুসলিম নেতাদের একটি মিলিত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানগণ হিন্দুদেরকে অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করলে

---

[৩৬৩] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০*

[৩৬৪] *ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪২১*

[৩৬৫] *ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত পৃঃ৪২১*

[৩৬৬] *ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পঃ১৫০*

[৩৬৭] *সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২১*

Dhaka University Institutional Repository

তারা তা সমর্থন করেন এবং গান্ধীজী অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের ৮ই জুলাই করাচিতে খেলাফত কমিটির সম্মেলনে ভারতীয়দের আইন অমান্য আন্দোলন এমনকি স্বাধীনতার ঘোষণার হুশিয়ারী উচ্চারনকরা হয়। কংগ্রেস ও খেলাফত সম্মেলনের প্রস্তাব সমর্থন করে। তৎসঙ্গে কংগ্রেস তার প্রাদেশিক কমিটিগুলোকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে বলে।[৩৬৮] অতঃপর ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে গান্ধীর অসহযোগ নীতি অনুমোদন করে এবং কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ ও পূর্ণ স্বরাজের দাবী ঘোষণা করে অসহযোগ কর্মসূচীর মধ্যে সরকারী চাকুরী ও পদবী ত্যাগ করা, আদালত ও আইন ব্যবসা ছেড়ে দেয়া, বিলাতি জিনিস-পত্র বর্জন ইত্যাদি ছিল। এ সময় গান্ধী তার 'কায়সার-ই-হিন্দ' পদক প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৬৯]

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী বহু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ সময় কলকাতায় একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় (National college) প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব আন্দোলনকে বৃটিশ সরকার কঠের ভাবে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। খিলাফত আন্দোলনে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর সবিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে ডঃ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ লিখেন, খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে মাওলানা বাকী কলকাতা খিলাফত কমিটির সভাপতি মাওলানা অবুল কালাম আজাদের সাহচর্য লাভ করেন এবং ইসলামী ও স্বাধীনতা কামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৯-১৯২০ সালে তিনি মাওলানা আজাদের নির্দেশে বংগীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে খিলাফত-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। এখানে তিনি ছয় মাস যাবত ঢাকার খিলাফত নেতা খাজা আব্দুল করীমের বাসায় অবস্থান করে কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে মফস্বলে কাজ করার জন্য পাঠাতেন। ঐ সময় তিনি ঢাকা, গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও অন্যান্য অঞ্চলে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করেন এবং জনগণকে আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।[৩৭০]

খিলাফত, অসহযোগ ও আইন অমান্য প্রতিটি আন্দোলনেই মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী অসামান্য অবদান রেখেছেন। আন্দোলনগুলোতে তার সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তিনি বৃটিশ সরকারের

---

[৩৬৮] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫*

[৩৬৯] *মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২*

[৩৭০] *আলী, মেহরাব : দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দেলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫৩*

Dhaka University Institutional Repository

রোষানলে পড়েন। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ যথার্থই লিখেছেন, 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাওলানা বাকীর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি খিলাফত আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং কংগ্রেসী নেতাদের সাথে কারাবরণ করেন।[৩৭১] দিনাজপুরের কৃতি সন্তান হিসেবে খিরাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী দিনাজপুরবাসীকে সাথে নিয়ে বৃটিশ বিরোধী যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিনাজপুরের ইতিহাস গবেষক মেহরাব আলী লিখেছেন,

"দিনাজপুরের খেলাফত আন্দোলনে যাহারা ছিলেন মূল প্রাণ তাহাদের মধ্যে মৌলানা আবাদুল্লাহিল বাকী, মৌলানা মনিরুদ্দিন আনোয়ারী, মৌলানা আব্দুর রহমান সৈয়দ মৌলানা আব্দুল্লাহ এবং 'মুসলমান সভার' সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ বাদেও অনেক লুপ্তনামা রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।[৩৭২] তিনি আরও লিখেছেন "উপরোক্ত মৌলবী মৌলানাগণের বক্তৃতার পরে সে দিনাজপুরের মুসলমানদের শুধু ধর্মীয় ভাবই পুনোদ্দীপ্ত হয় নাই বরং এই সুযোগে গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব রাজনৈতিক জাগরণও দেখা দিয়েছিল"।[৩৭৩]

আন্দোলন সংগ্রামে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও তার অনুজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী যে ঐতিহাসিক অবদান তার স্বীকৃতি দিয়ে মেহরাব আলী লিখেছেন,"খেলাফত আন্দোলনের নামে বৃটিশ বিরোধী প্রচারকার্য চালাইতে গিয়া 'বাকী ও কাফী' ভ্রাতৃদ্বয় পর পর কয়েকবার কারাবরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠীর জেলখানায় ভীষনভাবে নির্যাতিত হন।[৩৭৪]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ খেলাফত উপলক্ষে পাক-ভারত ব্যাপী হরতাল ঘোষিত হইলে দিনাজপুরেও তাহা ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হয়। এই হরতাল উদযাপিত হইবার পর পরই মহাত্মা গান্ধী বৃহত্তর পরিকল্পনায় আবার একটি সর্ব ভারতীয় হরতাল ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার অনুবর্ত্তীয়তায় দিনাজপুরেও সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই হরতাল উপলক্ষে মৌলানা বাকী, মৌলানা কাফী, মৌলানা মনিরুদ্দিন আনোয়ারী ও মৌলানা আব্দুর রহমান সৈয়দী প্রমুখ

---

[৩৭১] *ডঃ মোহম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ২৬০*

[৩৭২] *মেহরাব আলী, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৩১*

[৩৭৩] *মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৩১*

[৩৭৪] *মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২*

Dhaka University Institutional Repository

খেলাফত পাগল নেতৃবৃন্দের ছুটাছুটি ও হাঁকডাক বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ছিল। হরতালের উদ্যোক্তাগনের বাহাদুরির গুণে সেই দিন দিনাজপুর শহরস্থিত রেল বাজারের হাট পর্যন্ত বসে নাই। শহরের দোকান পাট মাত্রই বন্ধ ছিল । জেলখানা মসজিদ প্রাঙ্গনে বিরাট রাজনৈতিক সভা আহুত হইয়াছিল। হাজার হাজার জনতার সম্মুখে সেদিন দিনাজপুরের নেতাদের মধ্যে অনেকে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জানাইয়াছিলেন বৈদেশিক সরকারের শাসন, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দৃপ্ত- কণ্ঠ প্রতিবাদ।[৩৭৫]

বাংলার নেতৃস্থানীয় আলিমদের মধ্যে কংগ্রেস ভাবাপন্ন কতিপয় আলিম আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পারন করেন। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, পীর বাদশা মিয়া ও মৌলভী শামসুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৭৬]

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন করে গ্রেফতার হন (১৯৩০)। ঐ আন্দোলনের শেষের দিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তিনি কারাবরণ করেন (১৯৩২)।[৩৭৭]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ১৯৩৩ সালে প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩৪ সালে প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরুপে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি প্রজা পার্টি ও কৃষক প্রজাপার্টির সহ সভাপতি ছিলেন ।[৩৭৮]

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল বংগ কৃষক প্রজাপার্টির সভাপতিও ছিলেন। পার্টির শেষ সম্মেলন টাঙ্গাইলের ভেংগুলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালের ২ শে ফেব্রুয়ারী। সভাপতিরুপে মাওলানা বাকী তাতে সারগর্ভ ও সুচিন্তিত ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে তাঁর সভাপতিত্বে দিনাজপুর জেলা কৃষক প্রজা আন্দোলনের এক সাধারণ অধিবেশন দিনাজপুর শহরস্থিত ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।[৩৭৯]

---

[৩৭৫] *মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত ১৩৩ ও ১৩৪*

[৩৭৬] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০*

[৩৭৭] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৯০*

[৩৭৮] *আব্দুল হাকীম (সম্পা) বাংলা বিশ্বকোষ (১), ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৬৯-৭; আরাফাত, ঢাকা, ৩০ মে ১৯৬৬) উদৃত: রাজনীতিতে বঙ্গীয়, পৃঃ ১০২*

[৩৭৯] *মেহরাব আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭*

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহিল বাকীর নিজ জেলা দিনাজপুরের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

তৎকালীন মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও অসাধারণ কুটনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী। তিনিও দিনাজপুরের লোক। তার মত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন বহুদর্শী আরবী শিক্ষিত জননেতা ঐ একজনই জন্মেছিলেন একালে ও সেকালের দিনাজপুরে, এমনকি বাংলাদেশে।[৩৮০]

মাওলানা ছিলেন অসাধারণ কুটবুদ্ধি ও মনোহারী মুগ্ধকারী বক্তৃতা শিল্পের অধিকারী বক্তা।[৩৮১]

মাওলানার আবেদন ছিল তিনিও দিনাজপুরবাসীর একজন। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলন কেন? তিনি কি বাঙালী মায়ের সন্তান নয়? তিনি বলেন, দেশের ও জাতির অধিকার আদায়ের দুর্দিনে তিনি কি উংরেজ বিরোধী আন্দোলন করেন নাই? খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, এমনকি বৃটিশ কেদা আন্দোলনে তার কি কোন অবদান নাই? আর এসব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন নাই-বৈদেশিক সরকারের কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হন নাই কি তিনি? আক্ষেপ করে বলেন যে, আব্দুল্লাহিল বাকী ছিল আপনাদের দরকারে অদরকারে, আপদে বিপদে সহায়তা ও সহযোগিতার সঙ্গী সাথী সেই আব্দুল্লাহিল বাকীকে বাদ দিয়ে কি করে দিনাজপুরের এই ভাষা আন্দোলন ? তাই আমি আপনাদের ডাক না পেয়েও স্বেচছায় ছুটে এসেছি এবং ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আপনারা সহিংসতার পথ পরিহার করুন। আমি চাই একটা রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যাটির গ্রহণযোগ্য সমাধান হোক। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সভাপতি ও আইন পরিষদের একজন এমপি রুপে আমি আমি আপনাদেরকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে রাষ্ট্র ভাষা সমস্যাটি আইন পরিষদেও এজেন্ডা রুপে উত্থপিত হোক।আর যদি আমার কথা ব্যর্থ হয় তাহলে জেনে রাখুন, আমিই হবো দিনাজপুরের সেই প্রথম ব্যক্তি- ভাষার দাবিতে যার বুকের রক্তে দিনাজপুরের রাজপথ হবে প্রথম রক্তে রঞ্জিত।[৩৮২]

---

[৩৮০] *(মেহরাব আলী পৃঃ ২১০)*

[৩৮১] *(পৃঃ২১১)*

[৩৮২] *(পৃঃ ২১১, প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন লেখক)*

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বক্তব্য-দিনাজপুর জেলার কৃতি সন্তান প্রাদেশিক পরিষদের একজন হাসান আলী। ২ মে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তিনি দিনাজপুরে জেলাবোর্ড প্রাঙ্গনে বিকালে বিরাট জনসভায় কালো পতাকা প্রদর্শনকারী হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার সামনে বক্তৃতা করেন।

অবশ্য উপরোক্ত ঘটনা আলোকে মাওলানা বাকীর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কুটনৈতিক চাতুর্যেও সুত্র ধওে কিছু আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া বাঞ্চনীয়।কারণ যে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বিরোধী পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নার একনায়কত্বসুলভ ঘোষণায় দেশর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদেও রাষ্ট্র ভাষার দাবিটি উপেক্ষিত হয় ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। সেক্ষেত্রে আন্দোলনের উগ্রমূর্তিও চিতায় ঘৃতাহুতি দেয়ার পরিবর্তে মাওলানার সদ্ভাব সমন্বয়বাদি নেতরি রাজনৈতিক সমঝোতার পথে আন্দোলনটি শান্ত করতে ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করার পদক্ষেপটি পাকিস্তানের জনকের হটকারী নীতির তুলনায় কিরুপ বিজ্ঞোচিত ও যুক্তিবাদি মাওলানার স্বীয় কর্মজীবনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধর্মান্ধতারনামে রক্ত রঞ্জিত রাজপথের বহুবিভৎস দৃশ্য দেখা আছে,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত পুত্রহারা অসংখ্য দুঃখিনী মায়ের করুন কান্না শ্রবণ করেছেন তিনি।তাই রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে দেশে হানাহানি হোক,রাজপথ রক্ত প্লাবিত হোক-তিনি আর সেই রক্তপাতের পুনরাবৃত্তি দেখতে চান নাই। শান্তিপূর্ণ পথে, যুক্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাটির স্থায়ী সমধান লাভের আগেই বিধির অমোঘ বিধানে উভয় নেতাই লোকান্তরিত হন।[৩৮৩]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর শহরে সংঘটিত এশটি অপূর্ব বা বিরল নীতি প্রণোদীত রাজনৈতিক ঘটঁনার কথা উল্লেখযোগ্য।ঘটনাটি এই যে, ঐসালের এপ্রিল মাসে গোলকুঠি ময়দানে একই সামিয়ানার নীচে ৫দিনের প্রোগ্রামে 'মুসলিম লীগ, মুসলিম শিক্ষা সমিতি,আঞ্জুমানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর সমিতি (হিন্দু সংগঠন) কংগ্রেস এবং স্বর্গীয় মহারাজা গিরিজানাথের স্মৃতি রক্ষাকমিটি, প্রভৃতি ৫টিসংগঠনের হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত আয়োজনে এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।অধিবেশন সমূহে বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ আবদুল করিম , প্রখ্যাত মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ, একজন মিশরীয় মাওলানা এবং বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও অসংখ্য হিন্দু মুসলমান নেতা ও জনসাধরণ যোগদান করেন। সাম্প্রদায়িক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে মিলেমিশে কাজ

[৩৮৩] *(পৃঃ-২১২)*

Dhaka University Institutional Repository

করায় এটি এশটি অপূর্ব সম্মেলন ছিল। তাই ঘটনাটিকে অভিনন্দিত করে সমকালীন মাসিক দিনাজপুর পত্রিকায় প্রশংসনীয় সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।[৩৮৪]

১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী মন্ত্র প্রচাররোপ লক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দিনাজপুরে আগমনের ঘঁনাটি ছিল জেলার ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তখন সময়টা ছিল ভয়ানক সন্ত্রাস ও সংঘাতে রাজনৈতিক উত্তেজনাময়। তখন সরকার ঘোষিত নির্দেশে দেশবন্ধুর পক্ষে কোন জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।কিন্তু দিনাজপুরের নেতৃবৃন্দ সরকরী নির্দেশ অগ্রাহ্য কওে কৌশলে দেশবন্ধুকে দিনাজপুওে আনার ব্যবস্থা করেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে আসেন তার পত্নী,ভগ্নী ও পালিতা কন্যা।

দু'দিনের প্রোগ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে (কংগ্রেস মাঠে) দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তৎকালীন দিনাজপুরের অগ্নিপুরুষ তরুণ মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী। ১৯৩৬ এর প্রাদেশিক রাজ্যসভার নির্বাচনের আগে শহরেওে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনের আয়োজকদেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুসলমান পক্ষে মাওলানা আবদুল্লালে বাকী ও হিন্দু পক্ষে প্রধান জননেতা যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। সম্মেলনের আলোচ্য সূচী ছিল 'কম্যুনাল এওয়ার্ড'। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাবী তথা আইনসভার সদস্য পদের আসন ভাগ নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা।

সম্মেলনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজিত পরিস্থিতিতে তেজস্বী মুসলিম জননেতা মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সভায় জনগণকে স্তম্ভিত করে দিয়ে উগ্রপন্থী হিন্দু নেতাদের বেহিসাবী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে মুসলমানগণকে সভাস্থল থেকে ওয়াক আউট করার আহবান জানান।[৩৮৫]

"১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে শীর্ষ কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু দিনাজপুরে আসেন মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের প্রোপাগাান্ডা করতে। কংগ্রেস মাঠে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সনে কলিকাতা থেকে আসেন বিপ্লবী অগ্নিকণ্ঠ সৈয়দ বদরুদ্দোজা। মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সভাপতিত্বে। ঈদগাহ বস্তী ময়দানে কৃষকপ্রজা পার্টিরও জনসভা

---

384 *(দিঃ পঃ বৈশাখ, ২১ সংখ্যা,১৩২৭)।*

385 *(পৃঃ ১১০)*

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তীব্রভাষী সৈয়দ বদরুদ্দোজার ঐতিহাসিক বক্তৃতার হুঙ্কারধ্বনি বহুদিন ধরে দিনাজপুরবাসীর অবচেতন মনকে স্মৃতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে রাখে।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালের দিকের কথা -কোনরুপ আগাম নোটিশ ব্যতিরকেই জমিয়ত-ই-ওলামায়ে হিন্দের অন্যতম নেতা মাওলানা আযাদ সোবহানী বাংলাদেশে সফর উদ্দেশ্যে হঠাৎ একদিন দিনাজপুরে এসে উপনীত হন। অতি তাড়াতাড়ির নোটিশে জেলখানা মসজিদ প্রাঙ্গনে এশটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন জমিয়ত-ই- ওলামায়ে হিন্দের প্রাদেশিক শাখার সভপতি মাওলানা অবদুল্লাহেল বাকী।[৩৮৬]

খেলাফত পার্টি ছিল পুরোপুরি বৃটিশ বিরোধী সংগঠন। যদিও এটি ছিল আলেম ওলামা ও মৌলবাদী মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত। বিশের ও ত্রিশের দশকে; এমনকি তারো পূর্ববর্তী দিনে অত্র শহরে জমিয়ত-ই-ওলামা-ই-হিন্দের সভা সম্মেলন অনুষ্ঠিতহয় । যদিও এই সংস্থার মূল লক্ষ্য ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মন্ত্রে আপামর মুসলমান সমাজকে চেতিয়ে তোলা। কিন্তু প্রকারান্তওে চিন্তা চেতনায় প্রজ্ঞাশীল অলেমদের বক্তৃতার ঝংকারে নিদ্রিত প্রায় মুসলমান নির্বিশেষে সবার মন থেকে মোল্লা শাসন ভীতি, কুসংস্কও পীড়িত মনের দুর্বলতা,অনূবিশ্বাসের মোহ মুগ্ধতা প্রভৃতি নাজুক প্রবণতাগুলিও কেটে যেতে সহায়তা করে। ফলে মুসলমানদেও নিদ্রাভঙ্গ শুরু হয় ও ক্রমোন্নতভাবে মুসলিম মানসে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনার সঞ্চার শুরু হয়। তাই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন জেলার মুসলমানদেও পুনর্জাগণের যারা প্রথম মঞ্চ নির্মাণ করেন তারা ছিলেন আলেম সমাজ। জেলার আলেমকূল মধ্যমনী মাত্রই সেই মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ওলমা সংগঠনের কর্ণধার ঐ সমাজের বিপ্লবী ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা বাকী ও মাওলানা কাফী ভ্রাতৃদ্বয়।[৩৮৭]

জেলার শীর্ষ স্থানীয় আলেম মাত্রই খেলাফত আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হন।আন্দোলনটির জেলার নীতিনির্ধারক কর্ণধার ছিলেন ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য যে সব আলেম ওলামা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা মনিরউদ্দিন আনওয়ারী, মাওলানা অবদুর রহমান, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা হাফিজউদ্দিন, মাওলানা জহিরউদ্দিন নূরী, মাওলানা আজহারুর রহমান প্রমুখে

---

[৩৮৬] *(পৃঃ ১১২)*

[৩৮৭] *(পৃঃ ১৭৬)*

Dhaka University Institutional Repository

নাম উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের নির্ভীক অগ্রণায়ক মাওলানা ভ্রাতৃদ্বয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চালাতে গিয়ে বক্তৃতার মঞ্চেই গ্রেফতার হন এবং বিদেশী ঔপনিবেশবাদী স্বৈরাচারী শাসকের কারাগাওে নিক্ষিপ্ত হয়ে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেন।[৩৮৮]

দিনাজপুরের রাজনীতির মধ্যমণি মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী

কৃষক প্রজা পার্টিতে মাওলানা বাকী ঃ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস গবেষক মেহরাব আলীর 'দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় দিনাজপুর জেলায় এ. কে ফজলুল হকের কৃষব প্রজা পার্টি গঠিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই। পরবর্তী সময়ে 'মুসলিম লীগ' মূখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে কৃষক প্রজাপার্টিই স্থানীয় মুসলিম কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়ে যেসব আলিম কৃষক প্রজা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তন্মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদ, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৮৯]

সে সময়ে দিনাজপুরে মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকীই ছিলেন কৃষক প্রজাপার্টির মধ্যমণি। মেহরাব আলী লিখেছেন,

"১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর সভাপতিত্বে জেলা কৃষক প্রজাপার্টির একটি সাধারণ অধিবেশন বসে শহরস্থিত ঈদগাহ ময়দানে। সৈয়দ বদরুদ্দোজা ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি। দিনাজপুরের ইতিহাস আরও বহু স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে এই সম্মেলনের কথা সহজে স্মৃতি বিলীন হইবেনা শুধু একটি কারণে- কারণ এই দিনের তীব্র ভাষী সৈয়দ বদরুদ্দোজার বক্তৃতার হুঙ্কার ধ্বনি বহুদিন ধরিয়া দিনাজপুরবাসীর অবচেতন প্রাণাত্মাকে জাগৃতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।" [৩৯০]

---

[৩৮৮] *(পৃঃ ১৭৬)*

[৩৮৯] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১*

[৩৯০] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ছিলেন দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তার মুসলিম লীগে যোগদান প্রসঙ্গে মেহরাব আলী লিখেন, 'দিনাজপুরের প্রধান রাজনৈতিক নেতা বলিয়া সম্মানিত মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকী বহু বিলম্বে মুসলীম লীগে যোগদান করেন (১৯৪৬)।[৩৯১] মেহরাব আলী আরও লিখেছেন "১৯৪৬ খ্রষ্টাব্দের দিনাজপুরের জেলা মুসলিম লীগের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা ছিল পাকিস্তানের বহু বিখ্যাত আলেম ও রাজনৈতিক নেতা মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মুসলিম লীগে যোগদান। খুব সম্ভব, এতদিন ধরিয়া পাক-ভারতীয় রাজনীতির নাড়ী নক্ষত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দ্বারা তিনি এই সত্যই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, দেশের রাজনীতিতে আগামী সিংহাসন কায়েম করিতে হইলে মুসলিম লীগে যোগদান করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই।[৩৯২]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মুসলিম লীগে যোগদানে জেলা মুসলিম লীগ তথা দিনাজপুরের রাজনীতিতে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং রাজনীতিতে মাওলানা বাকীর যে স্বার্থক পদচারণা ছিল তারই চমৎকার বর্ণনা ধারা উঠে এসেছে মেহরাব আলীর নিম্নোক্ত লেখনীতে-

"মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী লীগে যোগদান করার পর জেলা লীগের কার্যকরী কমিটির কাঠামোটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে অনেক নিঃস্বার্থ কর্মীকে পদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার ওয়াস্তে আসন ছাড়িয়া দিতে হয়। ফলে এতদিনের জেলা লীগের প্রেসিডেন্ট মৌঃ হাসান আলী নামিয়া আসেন সেক্রেটারীর পদে এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী জেলা লীগের আদি কর্মী মৌঃ নূরুল হুদা চৌধুরী (১) তাঁহার ওয়াস্তে নির্বাচনী আসন পর্যন্ত ছাড়িয়া দেন। দিনাজপুরের মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী তেমনি একজন সৌভাগ্যবান রাজনীতিক যাঁহার জন্ম হইয়াছিল নেতৃত্বের দন্ড হস্তে ধারণ করিয়া। অসাধারণ সূক্ষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন, নির্ভিক চিত্ত-শক্তির অধিকারী, তীব্র কূটনীতি-জ্ঞান সম্পন্ন এবং চরম আভিজাত মন্য মৌলানা বাকী যেদিন হইতে জেলা মুসলিম লীগে যোগদান করেন, সেই দিন হইতে এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত লীগ-পরিচালক বৃন্দের আসন ও বসন যেন আলগা হইয়া যায়। তাঁহার রাজনৈতিক চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি যে কোন প্রকার সঙ্কটময় পরিস্থিতির কবলে পড়িয়াও ঘাবরাবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন ছিল একটানা দীর্ঘ ও গৌরবময় এবং তিনি

---

[৩৯১] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯*

[৩৯২] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩,৭৫*

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন দিনাজপুরের রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসে উজ্জল জ্যোতিষ্ক স্বরুপ।ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি- কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার সমকক্ষ নির্ভিক নেতৃত্বের নজীর এই জেলার ইতিহাসে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী যতদিন জীবিত ছিলেন, দিনাজপুরের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিলেন তিনি। তাঁহারই ইঙ্গিত ক্রমে জেলার রাজনীতির নীতি-নির্দেশ পরিচালিত হইত ঠিক যাদুগরের পুতুল খেলার মত।[৩৯৩]

ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্বনীতির (Two nations Theory) ভিত্তিতে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসাবে ভারত দ্বিখন্ডিত হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। দিনাজপুর জেরায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরীখে পাকিস্তানভুক্ত করার অভিযানে জেলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। মেহরাব আলীর ভাষায় "মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলানা হাসান আলী, মৌলানা নূরুল হুদা চৌধুরী, মৌঃ নূরুল হক চৌধুরী পমুখ নেতৃবৃন্দের দিনাজপুরবাসীর দাবীর প্রস্তাব লইয়া র‍্যাডক্লিপ কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেন"।[৩৯৪]

মাওলানা সাহেব ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদানপূর্বক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বংগীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান অর্জনের পর তিনি যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্যরূপে কাজ করেন।[৩৯৫]

বাংলার আলিমগণের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে যারা সক্রিয় সহায়তা করেছে তাদের মধ্যে বশীরহাটের মাওলানা রুহুল আমিন, খুলনার ময়েজ্জুদ্দিন হামিদী,শর্ষিনার পীর মাওলানা নেসারউদ্দিন আহমদ, ফুরফরার পীর মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখের সাথে দিনাজপুরের মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৬ সালের বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মধ্য দিনাজপুর এলাকা থেকে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী নির্বাচিত হন।[৩৯৬] পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য আসাম ও বেঙ্গল মুসলিগ লীগের নেতৃবৃন্দ সিলেটে সমবেত হন এবং তারা

---

[৩৯৩] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬*

[৩৯৪] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯*

[৩৯৫] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৪২*

[৩৯৬] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩*

Dhaka University Institutional Repository

তাতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। সিলেটের লোকেরা যেন তাদের রায় পাকিস্তানের পক্ষে দেয় এই ছিল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ বিষয়টি চিত্রায়িত করেছেন এভাবে– "তৎকালীন বাংলার রাজনীতি মঞ্চে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী এতটা উচ্চ অবস্থানে ছিলেন যে, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের বিকল্প হিসেবে তাকে ভাবা হয়েছে। যেমনটি দেখা যায় আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যে–আমরা কৃষক প্রজা পার্টির ঝান্ডা খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া হক সাহেবের স্থলে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীকে সভাপতি করিলাম"।[৩৯৭]

কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি হিসেবে মাওলানা বাকী যথেষ্ট দক্ষতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন টাংগাইল মহকুমার অন্তর্গত ভেংগুলা অজপাড়াগাঁয়ে নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা সম্মিলনীর যে অধিবেশন বসেছিল তাতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে "সভাপতি হিসাবে মাওলানা আবদুল্লহিল বাকী সাহেব খুব সারগর্ভ সুচিন্তিত অভিবাসন দিয়েছিলেন"।[৩৯৮] মাওলানা বাকীর কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য মিলে সমকালীন রাজনীতি ও সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের লেখনীতে । তিনি লিখেছেন, "মাওলানা বাকী সাহেব ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী রাজনীতিক।"[৩৯৯]

১৯৩৩ সালে মাওলানা বাকী একে ফজলুল হক গঠিত কৃষক প্রজা অন্দোলনে যোগ দেন ।[৪০০] প্রজা এসেম্বলী পার্টির মনোনীত প্রার্থীরূপে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।(১৯৩৪ খৃঃ)।[৪০১]

১৯৪০ সালে তাঁর সভাপতিত্বে দিনাজপুর জেলা কৃষক-প্রজা আন্দোলনের এক সাধারণ অধিবেশন দিনাজপুর শহরস্থ ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের পর দিনাজপুর কৃষক-প্রজা পার্টির আর কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের খোজ মেলেনা।[৪০২]

---

[৩৯৭] *আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০*

[৩৯৮] *আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬*

[৩৯৯] *আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪*

[৪০০] *সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, কলকাতা ১৯৭৬, পৃঃ ৪২। উদ্ধৃত; রাজনীতিতে বঙ্গীয়, পৃঃ১৪৪*

[৪০১] *সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪২, উদ্ধৃত, পৃঃ ১৪৪*

[৪০২] *মেহরাব আলী, পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৫৭*

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে তাঁকে মুসলিম লীগে যোগদান করার জন্য জেলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। যুক্তি দেখানো হয় যে, এত বড় আলেম ও নেতা হয়েও কেন তিনি মুসলিম লীগে যোগদান না করে কংগ্রেসেই থেকে যাচ্ছেন।[৪০৩]

যদিও তিনি তখনো নামে মাত্র 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ- হিন্দ এর বাংলা শাখার বা 'জমিয়ত' এর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলনা।[৪০৪] যা হোক অনেক বিলম্বে হলেও তিনি মুসলীম লীগে যোগদান করেন এবং সরাসরি দিনাজপুর জেলার মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বচিত হন।[৪০৫] ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলীম লীগের প্রার্থী হিসেবে মাওলানা বাকী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (M.L.A) নির্বাচিত হন।[৪০৬]

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী এতই বরেন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, যে কোন আযীমুশশান মহতি সভার সভাপতি হিসেবে তিনি বরিত হতেন। ১৯৪৫ সালে সম্ভবতঃ শরৎকালের কোন একদিনে আগাম নোটিশ ব্যতিরকেই জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম বরেন্য নেতা মাওলান আযাদ সুবহানী বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে দিনাজপুর শহরে এসে পৌছান। তাৎক্ষণিক নোটিশে জেলখনা জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি মহতি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী।[৪০৭] পকিস্তান অর্জনের পর তিনি যুগপদ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্যরূপে কাজ করেন।[৪০৮]

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর সংবিধানকে ইসলামী ধাচে ঢেলে সাজানো সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করেন। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। "প্রথমে গণপরিষদে গৃহীত আদর্শমূলক প্রস্তাব এবং মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট কুরআন ও সুন্নাহকে

---

[৪০৩] *আবদুল হাদী মুহাম্মদ অনওয়ার, অল্লামা আবদুল্লাহিল বাকী (রহ) সংক্ষিপ্ত জীবনী পৃঃ ৩*

[৪০৪] *ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫।*

[৪০৫] *মুহাম্মদ আদমউদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪, মেহরাব আলী ।ঐ, ১৭৩ ও ১৭৬ পৃঃ*

[৪০৬] *সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস,ঐ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পৃঃ ৪২, আদমউদ্দিন*

[৪০৭] *আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, আল্লামা আবদুল্লহিল.. পৃঃ ৪*

[৪০৮] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ন স্বীকৃতি দেওয়ার কথা হয়। উহার মূলে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সংগ্রামী অবদান অনস্বীকার্য"।[৪০৯]

ভাষা জ্ঞানী মাওলানা বাকী

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর ভাষা জ্ঞানের উচ্চাসনের কথা লিখতে গিয়ে বলেন, "অরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি কিছুটা ইংরেজীও জানতেন।[৪১০]

১৯২০ ইং সালের প্রথম দিকে মোতাবেক ২০ হতে ২৪শে চৈত্র পর্যন্ত দিনাজপুরের গোলকুঠি ময়দানে মুসলিম লীগ, মুসলিম শিক্ষা সমিতি ও আহলে হাদীস সম্মেলনের সঙ্গে 'দিনাজপুর' সভা'র (হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) যে সম্মিলিত সভার আয়োজন করা হয়েছিল তার সূচী অনুযায়ী ২৩ ও ২৪শে চৈত্র 'আহলে হাদীস সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মাওলানা আকরাম খাঁ অগ্নিঝড়া বক্তৃতা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ সম্মিলন স্থলের শ্রোতৃমণ্ডলীকে যারপর নাই উদ্দীপ্ত করেন। এই সম্মিলনে মিশর দেশীয় জনৈক মাওলানা আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতার 'একস্ টেম্পোর' বঙ্গানুবাদ করে শ্রোতাগণকে শুনিয়ে বিমুগ্ধ করেন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মৌলানা আবদুল্লহিল বাকী ।[৪১১]

ভিন্ন ভাষা থেকে কোন বক্তৃতা বঙ্গানুবাদ করলে তিনি অতি চমৎকার বাংলা প্রয়োগ করে হুবুহু সে বক্তৃতা সকলকে শুনিয়ে দিতে পারতেন। ১৯২৯ সাল বগুড়া জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স

[৪০৯] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*

[৪১০] *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃঃ ২৬১)*

[৪১১] *মেহরাব আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনফারেন্সে মাওলানা আবুল কাসেম বানারসী বক্তৃতা করেন।সুন্দর বাংলা অনবাদ করেন মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (রহ) সাহেব। অনুবাদ শুনে ঢাকাস্থ বংশাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল জব্বার আনছারী মন্তব্য করেন 'ইনি মানুষ না জিন'।[৪১২]

মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ ৩য় বর্ষ; ১১-১২শ সংখ্যায় মোঃ আব্দুর রহমান মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর বিদ্যাবত্তা ও ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে লিখেছেন,আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা বর্তমান লেখকের পক্ষে অসম্ভব। বাংলা বই পুস্তকও তিনি যথেষ্ট পড়িতেন, এককালে 'আল ইছলাম' প্রভৃতি মাসিকে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরিনত বয়সে তিনি ইংরাজির ও চর্চা করেন। তাঁহাকে ইদানিং বড় বড় ইংরাজি বই এবং প্রতিদিন একখানা ইংরাজি পত্রকা পড়িতে দেখিতাম

বিদ্যানুরাগী ও আজীবন পাঠক মাওলানা বাকী

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তার জীবন শত ব্যস্ততার মধ্যেও জ্ঞান অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন যারপর নাই উৎসাহী। মোহাম্মদ আবদুর রহমান মাওলানা বাকী সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন, "মাওলানা ছাহেব ছিলেন আজীবন পাঠক। তাঁহার বাটিস্ত বিরাট লাইব্রেরী তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"[৪১৩]

দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ মাওলানা বাকীর মৃত্যুর পর শোক বাণীতে মাওলানা বাকীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "এছলামের শাস্ত্র ও সাহিত্যে তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি কোরান, হাদীস, ইতিহাস, দর্শন সম্বন্ধে কেতাব পড়িতেন। এইসব লইয়াই তিনি সবসসময় ভাবিতেন। আর সে ভাবনাকে কাজে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন।"[৪১৪]

তাঁর সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চার ঝোঁক প্রবণতার নিখুত বর্ণনা তুলে ধরে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখক তারই কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল হাদী মুহাম্মদ আনোয়ার লিখেছেন, "সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চার

[৪১২] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৪২*

[৪১৩] *মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ৩য় বর্ষ ১১-১২শ সংখ্যা, পৃঃ, ৪৭০*

[৪১৪] *মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ,৩য় বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা, পৃঃ, ৪৭৯*

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশে তিনি স্বীয় বাসভবনে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ব্যক্তিগতভাবে গড়ে তুলেন। এখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাজী আলমারীতে সারিবদ্ধভাবে সমাবেশ ঘটান এবং এটা তার বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞনানুশীলনের প্রকাশ। তিনি লেখাপড়া করার সময় এতটা মনযোগী ছিলেন যে পার্থিব সবকিছু ভুলে বসতেন। সাধারণত তখন কারো প্রবেশাধিকার ছিলনা লাইব্রেরী ঘরে।[৪১৫]

মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে মোহাম্মদ আবদুর রহমান তাঁর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানচর্চার ঐকান্তিক আগ্রহের কথা তুলে ধরেন এভাবে, "আরবী সাহিত্য ও ইছলামী শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা বর্তমান লেখকের পক্ষে অসম্ভব। বাংলা বই পুস্তক ও তিনি যথেষ্ট পড়িতেন, এককালে 'আল ইছলাম' প্রভৃতি মাসিকে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি ইংরাজিরও চর্চা করেন। তাঁহাকে ইদানিং বড় বড় ইংরাজী বই এবং একখান ইংরাজী পত্রিকা পড়িতে দেখিতাম। তিনি শুধু প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ...উৎসাহী পাঠক,সুসাহিত্যিক, ধর্মীয় শাস্ত্রবিশারদ, প্রখ্যাত বক্তা ও সদালাপীই ছিলেন না, একজন সত্যিকারের সাধক, নিরপেক্ষ বিচারক অক্লান্ত কর্মী, স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, বাস্তব রাজনীতিক, এক কথায় একজন আদর্শ নেতা ছিলেন।[৪১৬]

---

[৪১৫] *আল্লামা আবদুল্লহিল বাকী... পৃঃ৬*

[৪১৬] *মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ৩য় বর্ষ; ১১-১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৪৭০*

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহিল বাকীর সাহিত্য চর্চা ও লেখনী

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ছিলেন চিন্তাশীল সাহিত্যিক, বিভিন্ন ভাষায় সুপন্ডিত, বিশিষ্ট গবেষক ও সুলেখক। আরবী, ফার্সী সহ বিভিন্ন ভাষায় তার অনন্য দক্ষতার কারণে তার লেখাগুলো ছিল বহুমাত্রিক আহরিত জ্ঞানের সার নির্জাস। একই সংগে লেখাগুলোতে থাকত মৌলিকত্ব। তিনি দেশ ও মুসলিম জাতির কল্যাণ চিন্তায় সদা ব্যকুলচিত্ত ছিলেন। তাই তার লেখণীতেও ছিল স্বদেশ ও স্বদেশের মুসলমানদের প্রয়োজনকে সামনে নিয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা সমৃদ্ধ। তাঁর লেখনী বিদেগ্ধ সমাজকে আলোড়িত করেছে, আর গোটা মুসলিম সমাজকে জড়তা ও কুসংস্কার মুক্তহয়ে এগিয়ে চলতে উদ্দৌপ্ত করেছে। তার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মুহাম্মদ আবদুর রহমান যথাযথই লিখেছেন,"দেহের আরাম, মনের শান্তি, পারিবারিক সমৃদ্ধি, ইসলামী দর্শন, সমাজ সংস্কার, হাদিস, কোরআন ও ফিকাহ্ সম্বন্ধে আল এসলাম ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন।[৪১৭] সংসারের উন্নতি সবকিছু

[৪১৭] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর দিনাজপুর, বাংলাদেশ সরকার: সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ঢাকা-১৯৯১, পৃ:৩৭৪*

Dhaka University Institutional Repository

বিসর্জন দিয়া দেশ ও মিল্লাতের চিন্তায় এবং নিরলস কর্মসাধনায় তিনি নিজেকে তিলে তিলে বিলাইয়া দেন।"[৪১৮]

আল এসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুল্লাহিল বাকীর কতিপয় প্রবন্ধের তালিকা ঃ

"আল এসলাম"১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২	কুরআন	(নাম সমন্ধে আলোচনা) পৃষ্ঠা ৩-১৬, মোট ১২ পৃষ্ঠা
"আল এসলাম"১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা	কুরআন	(লিখন ও সম্পাদনা) পৃষ্ঠা ২২৪-২৩২, মোট ৯ পৃষ্ঠা
"আল এসলাম"১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	ডাঃ মিঙ্গানা ও কুরআন	(লিখন ও সম্পাদনা) পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫৭, মোট ৭ পৃষ্ঠা
"আল এসলাম"১ম ভাগ, ১১ শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২২	তাবাকাতে এবনে সায়াদ	(পুস্তকালোচনা) পৃষ্ঠা ৬৫৬-৬৫৮, মোট ৩ পৃষ্ঠা
"আল এসলাম" ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৩২২	অমর কবি হাফেজ	(জীবনী) পৃষ্ঠা ৭২-৭৪, মোট ৩ পৃষ্ঠা

[৪১৮] *তর্জুমানুল হাদীস, ৩য় বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা ১৩৭২হিঃ, পৃ:৪৭০*

Dhaka University Institutional Repository

“আল এসলাম”২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা ,ভাদ্র ১৩২৩	একখানি উপাদেয় প্রাচীন গ্রন্থ	নেহায়াতুল এরাব ফি ফুনুনেল আদাব , পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬০, মোট ২ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ,	মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার	পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯, মোট ২ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা , ২য় ভাগ ২য় সংখ্যা	সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী	পৃষ্ঠা ৭-১৬, মোট ১০ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৬৫-৭২, মোট ৮ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা ,	ভূগোল ও মুসলমান	পৃষ্ঠা ১১-১২, মোট ২২ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা	ভূগোল ও মুসলমান	পৃষ্ঠা ২২৫-২৩৩, মোট ৯ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ১১ সংখ্যা	সাম্যপদ এবং মুসলমান	পৃষ্ঠা ৫৮০-৫৮৪, মোট ৫ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ১১ সংখ্যা	মুসলমানদের উদারতা ও তাহার প্রতিদান	পৃষ্ঠা ৬০৮-৬১৭, মোট ১০ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ১২ সংখ্যা	সূদী হোসায়েন এবয় মনসুর হাল্লাজ	(ঐতিহাসিক দিগের মতামত) পৃষ্ঠা ৬২৫-৬৩২, মোট ৮ পৃষ্ঠা
“আল এসলাম”৩য় ভাগ, ১২ সংখ্যা	অনধিকার চর্চা (অসমাপ্ত)	পৃষ্ঠা ৬৩৩-৬৩৮, মোট ৬ পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

আল এসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত তার কতিপয় লেখনীর পর্যালোচনা

সাহাবী জীবনী ও সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী, উল্লেখিত প্রবন্ধে আব্দুল্লাহিল বাকী প্রথমেই সাহাবীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। এবং এই সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের বিচার বিশ্লেষণ তিনি যে সকল বিশ্ববিশ্রূত দুর্লভ গ্রন্থরাজী থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তাতে তার বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। সাহাবীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখিছেন, ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর মত এই যে, "বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সজ্ঞান অবস্থায় যে মোসলমান রসুলল্লাহকে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সাহাবী।" পণ্ডিত এবনে আব্দুল বার বলেনঃ "রাসূল করিমের সময় যে সকল মোসলমান বর্তমান ছিলেন, রাসূলের দর্শন লাভ করে থাকুন বা না থাকুন তাঁহারা সকলই সাহাবী।"[৪১৯]

[৪১৯] *আল-এসলাম- বৈশাখ, ১৩২৩, ২য় ভাগ, পৃ:৭*

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীর সংখ্যা নিরূপণ করতে গিয়ে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর স্বনামধন্য মোহাদ্দেস আবু জার আর মতামতকে অগ্রাধিকার গিয়ে লিখেছেন- রাসূলে করিমের স্বর্গারোহণের সময় মোসলমানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ সহস্র ছিল।[৪২০] সাহাবীদের লিপিবদ্ধকৃত জীবনী বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "মোসলমান ঐতিহাসিকগণ সমুদয় সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এবনে সামাদ , (১) এবনে মানদাহ (২) আবু মুসা, (৩) আবু নইম, (৪) এবনে আব্দুল বার, (৫) তাবারী (৬) এবনে আসীর, (৭) জাহাবী, এবং (১০) এবনে হাজার প্রভৃতি ইতিহাস লিখকগণ সাহাবীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কেবল ধর্মগুরুর নহে, তাঁহার প্রায় ৯ সহস্র সহচরের ও সম্পূর্ণ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার দৃষ্টান্ত যদিও পৃথিবীতে একমাত্র এসলামের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি আক্ষেপের সহিত ধীকার করিতে হইতেছে যে, সমুদয় সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভপর হয় নাই।"[৪২১]

এই লেখার শেষাংশে তিনি হাদীস বর্ণনার সংখ্যা হিসেবে সাহাবাগণের স্তর বিন্যাস করে দেখিয়েছেন। আব্দুল্লাহিল বাকী তার এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবাগণের সম্যক চিত্র তুলে ধরেছেন। যে চিত্রটি সংক্ষিপ্ত হলেও স্বার্থক্য ও পূর্ণাক্ত। তিনি তাঁর লেখনীর পরবর্তী অংশে সাহাবাগনের হাদীস বর্ণনার নিরীখে তাদের অবস্থান নির্দেশ করে তালিকা পেশের মাধ্যমে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

আলোচনার উপসংহারে তিনি লিখেছেনঃ

"এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সাহাবা আছেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে আমরা মোট ২১৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই মহাত্মগণের কল্যানেই মোসলমানগণ পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীর রত্নাগার যে রত্নে বঞ্চিত, সেই হাদীস শাস্ত্রের ন্যায়অতুলনীয় রত্নের অধিকারী।"[৪২২]

মুদ্রা যন্ত্রের আবিস্কারক

[৪২০] *মোকাদ্দমা এবলেস্‌সলাহ, ১৫১ পৃ:*

[৪২১] *আল-এসলাম- বৈশাখ, ১৩২৩, ২য় ভাগ, পৃ:১২*

[৪২২] *আল-এসলাম- জৈষ্ঠ, ১৩২৩, ২য় ভাগ, পৃ:৭২*

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত প্রবন্ধে লেখক বিশরীয় গবেষক আল্লামা আহমদ জাকীর প্রমাণিত তত্ত্বকে উপস্থাপন করে লিখেছেন, "ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ার অনেক পূর্বে মিশর ও স্পেন দেশে মোসলমানগণ তাহা আবিস্কার ও ব্যবহার করেছিলেন।"[৪২৩]

একখানি উপাদেয় প্রাচীন গ্রন্হ 'নেহায়তুল এরাব ফি ফুনুনিল আদাব' উক্ত মূল্যবান প্রবন্ধে লেখক আব্দুল্লাহিল বাকী মিসরের দাস বংশীয় প্রথিত যশা শাসক মোহাম্মদ কালাউলের সময়কালকে (হিঃ ৬৯৩-৭৪১) আল্লাম নোওয়ারীর ৩০ খন্ডে সমাপ্ত 'নেহায়াতুল এবার' নামক দুর্লভ গ্রন্থের উপর চমৎকার সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,"প্রকৃত পক্ষে ইহা সমসাময়িক যুগের 'দায়েরাতুল মাআরেফ বা বিশ্বকোষ' গ্রন্থকার সম্পূর্ণ গ্রন্থকে ৫টা প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন-

১ম অংশে- জ্যোতিষ, ভূতত্ব ও প্রাকৃত বিজ্ঞান।

২য় অংশে- মানব ও তাহার আবশ্যকীয় এর আবিস্কৃত বিষয় সকল।

৩য় অংশে- প্রাণী জগৎ।

৪র্থ অংশ- উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে।

৫ম অংশে- ইতিহাস।

প্রত্যেক অংশ একাধিক খন্ডে এবং অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। সম্পূর্ণ গ্রন্থের ২০ খন্ডে ইতিহাস ও অবশিষ্ট ১০ খন্ডে অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচি হইয়াছে।"[৪২৪]

আব্দুল্লাহিল বাকী তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আলোচ্য 'নেহায়াতুল আরব' গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপকারিতা বিষয়টি তুলে ধরে দেখিয়েছেন গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের সুদৃঢ় অট্রালিক নির্মাণ করেছেন। তিনি উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন, হল্যান্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত এলবার্ট শেৎলটেন্স (১৬৮৬-১৭৫০) নেহায়াতুল আরবের সাহায্যে পুরাতন ইতিহাস সংকলন করেন।

জার্মান অধ্যাপক রয়েস্ক (J.J.Reiske, 1716-1774) একে অবলম্বন করে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সিরিয়ার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এভাবে অন্যান্য অনেক ইতিহাস গবেষক

---

[৪২৩] *আল-এসলাম- শ্রাবণ, ১৩২৩, ৪র্থ সংখ্যা, ২য় ভাগ, পৃ:২২৭*

[৪২৪] *আল-এসলাম- ভাদ্র, ১৩২৩, ৫ম সংখ্যা, ২য় ভাগ, পৃ:২৫৬*

Dhaka University Institutional Repository

একে অবলম্বন করে সিসিল দ্বীপ, আরব জাতির ইসলামী যুগ, মিশরের মুসলমান শাসকদের ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।"[৪২৫]

কোরআন

প্রবন্ধটির শুরুতেই নাম সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলেছেন, জগতে প্রত্যেক বস্তরই একটা নির্দিষ্ট নাম আছে। অন্যান্য বস্ত হইতে বিশেষের স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই এই নাম করণের উদ্দেশ্য।[৪২৬] কুরআনের নামকরণ সম্পর্কে তিনি পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণ করেন।,"কিন্ত কুরআন বস নির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছে যে, আমার নাম কোরআন। একবার নহে, দুইবার নহে, ৬০ বার কোরআন বলিয়াছে যে, আমার নাম কোরআন। কোরআন মজিদ অন্যান্য নামেও অভিহিত থাকে, কিন্ত তাহাও কোরআনই হইয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে।"[৪২৭]

তিনি কুরআন মজিদের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এভাবে,

"কোরআন মজিদের মধ্যে তাহার যে সকল সাধারণ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে সে গুলি তাহার বিশ্লেষণ।" নিম্নলিখিত নামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুনঃ

নূর জ্যোতি), শোফাউন (আরোগ্য, সুধা) হোদা (জ্ঞান, পথ প্রদর্শক), জেকরুন (স্মরণ, উপদেশ) ইত্যাদি। ৬পারা, ৪রুকু,; ৯পারা, ৯রুকু; ২৫ পারা,৬রুকু; ১১পারা, ১১রুকু; ১৫পারা , ৯রুকু; ১৪পারা ১৯রুকু।

কোরআন প্রবন্ধে আবদুল্লাহিল আল কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কুরআনের আয়াতগুলি পূর্ব থেকেই সুসাব্যস্থ ছিল। সাহাবাগণের প্রায় প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদে হাফেজ ছিলেন। কোরআন মোসহাফ বা গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছিল আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে তাঁরই নির্দেশক্রমে। তবে এই কাজে যারপর নেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। সহীহ আল বুখারীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী থেকে উদ্বৃত এনে তিনি লিখেছেন,

---

[৪২৫] *আল-এসলাম- ভাদ্র , ১৩২৩, ২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৃ:২৫৮*

[৪২৬] *আল-এসলাম- বৈশাখ, ১৩২২, ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা পৃ:৩*

[৪২৭] *আল-এসলাম- আষাঢ়, ১৩২২, ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ:৫*

Dhaka University Institutional Repository

"এবনে আবি দাউদ বলেন, ,হযরত আব বকর (রাঃ) ওমর এবং জায়েদের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আপনারা উভয়েই মসজিদের দ্বারদেশে উপবেশন করুন। এবং দুই সাক্ষীসহ কোরআন মজিদ কোন অংশকেহ উপস্থিত করিলে, তাহা লিখিয়া লইবেন। সাক্ষীগণ বলিবেন যে, ইহা রসূলুল্লাহর সম্মুখে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা হয় নাই। রসূলুল্লাহর সম্মুখে লিখিত হইয়াছে এইরূপ কোন অংশ প্রাপ্ত হইলে এবং নিসংশয়রূপে তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইলে তবে তাহা কোরআন মজিদে সন্নিবেশিত হইয়াছে।[৪২৮]

অনধিকার চর্চা

প্রবন্ধে আব্দুল্লাহিল বাকী হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক মুসলমানদের বিষয়ে অহেতুক কলম চালনার ব্যাপারে আক্ষেপ করে লিখেছেন,

"মোসলমানদের ভাষা ও সাহিত্যে কোন রূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, তাহাদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংবাদ না রাখিলেও, একটি মোসলমানী শব্দ ও বিশুদ্ধভাবে লেখিতে বা বলিতে না পারিলেও মোসলমানদের বিষয় লইয়া কলম চালাইতে তাঁহারা কোন প্রকার দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না।"[৪২৯]

কোন কোন হিন্দু হিন্দু লেখক কর্তৃক মুসলমানদের তাওহীদ বা একত্ববাদ, মক্কার বায়তুল্লাহ, হাজরে আসওয়াদ, আরাফার ময়দানে উপস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের জবাবে আব্দুল্লাহ আল বাকী আলোচ্য প্রবন্ধে লিখেছেন, "আসল কথা এই যে, মোসলমান ও আরবদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ ও অবসর বাবুদের মোটেও নাই, কিন্তু সেইগুলি লইয়া টানাটানি করিবার অন্যায় ...আন্দোলন করিবার আকাঙ্খা ও সময় তাহাদের যথেষ্টই আছে।"[৪৩০]

মুসলমানদের উদারতা ও তাহার প্রতিদান

---

[৪২৮] *ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, আল এসলাম, আষাঢ় ১৩২২, ৩য় সংখ্যা, ১৮২৩, পৃ: ৮৩*

[৪২৯] *আল এসলাম, চৈত্র ১৩২৪, ৩য় ভাগে, ১২শ সংখ্যা, পৃ: ৬৩৪*

[৪৩০] *আল এসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৭*

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রবন্ধে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী হিন্দু লেখক গণ কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি এ ধরণের ধারণা পোষণ করা যে মুসলমানগণ হিন্দু সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞ এবং জানতেও অনাগ্রাহী এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।[৪৩১] তিনি দেখিয়েছেন হাদীস ও তাফসীরের অনেক কিতাবেই হিন্দুস্থানের সম্মান ও গৌরবের কথা বিধৃত হয়েছে,"আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী তফসীর দুরে মনসুরে এর জারীর এবং এবন আসাকের হইতে, হযরত আলীর এই উক্তি উদ্বৃত্ত করিয়াছেন, 'আত ইয়াবু রিহান আরযুল হিন্দে' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা নির্ম্মল বায়ু ভারত ভূমির।" তাফসীরে দোর্ররে মনসুর, "বদউল খালক হযরত আদম বেহেশত হইতে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষেই আগমন করিয়াছিলেন।"[৪৩২] সুতরাং ভারতের গগণেই সর্ব্ব প্রথম নবুওয়াতের সূর্য্য উদিত হইয়াছিল।[৪৩৩] লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে বলিষ্ট প্রমাণ পেশ করে দেখিয়েছেন হিন্দু সাহিত্য ও দর্শন সব যুগেই মুসলিম পণ্ডিতেরা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে, কোনরূপ বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকে দেখেনি।

তাবাকাত এবনে সায়াদ

প্রবন্ধটিতে আব্দুল্লাহিল বাকী হিজরী ৩য় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বাগদাদের মোহাম্মদ এবনে সায়াদ জোহরী কর্তৃক লিখিত রাসূল (সাঃ) সাহাবা ও তাবেয়ীগণের জীবনী নিয়ে লিখিত ১২(বারো) খণ্ডে লিখিত তাবাকাত গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ মূলক আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধটিতে তাবাকাত গ্রন্থটির বিশ্বস্থতা ও সর্বজন গ্রাহ্যতার বিষয়ে ও আলোকপাত করেছেন। কোন খণ্ডে কোন বিষয়ে কোন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে তার একটি তালিকা তুলে ধরেছেন।[৪৩৪]

সুফী হোসায়েন এবন মনসুর হাল্লাজ

---

[৪৩১] *আল এসলাম, ফাল্গুন ১৩২৪, ৩য় ভাগ, পৃ: ৮*

[৪৩২] *হাজিরাতুল কুদস অবলম্বনে, প্রাগুক্ত, পৃ:৬১৩*

[৪৩৩] *হাজীরাতুল কুদস গ্রন্থের ৩৭৫ পৃঃ, উদ্বৃত, আল এসলাম, ফাল্গুন ১৩২৪, ৩য় ভাগ, ১১শ সংখ্যা*

[৪৩৪] *আল এসলাম, ফাল্গুন ১৩২২, ১ম ভাগ, ১১শ সংখ্যা, পৃ:৬৫৬-৬৫৮*

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত প্রবন্ধে আব্দুল্লাহিল বাকী প্রসিদ্ধ সুফী মনসুর হাল্লাজের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার পরিণতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এই লেখাটি তারিখে তাবারীর পরিশিষ্ট লেখক আল্লামা এবন সাআদ কোরতাবীর বিস্তৃত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন। মনসুর হাল্লাজের বিশ্বাস ছিল আকাশে এক খোদা আছে, আর জমিনে আছে আরেকজন। মনসুর হাল্লাজের বিশ্বাস এমন ও ছিল যে,

"যে ব্যাক্তি কোরায়েশদের কবরস্থানে গিয়া শহীদগণের কবরের নিকট দশদিন অবস্থান করত: নামায, রোজা ও প্রার্থনা করিবে.... অপরিস্কার লবন দ্বারা এফতার করিবে, তাহাকে অবশিষ্ট জীবনের মধ্যে আর কোন প্রকার এবাদত করিতে হইবে না।"[৪৩৫]

মনসুর হাল্লাজ তার বিভিন্ন মন্দ আকীদাহর স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হওয়ায় ৩০১ হি: বাগদাদে তাকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৪৩৬]

পীরের ধ্যান (পুস্তক)

আবুল হাছান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী আল কোরায়শী (রহঃ) পুস্তকটিতে মারফত পন্থীদের তাছাউয়ারে শায়খ বা মানসপটে পীরের মূর্তি ধ্যান করে ভক্তি প্রণত হয়ে ফয়েয লাভ করার সাধনাকে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

পীরপূজকদের ধ্যান কর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

"তাহারা যখনই কোন বিপদে পতিত হয় অথবা কোন গুরূত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হয়, তখনই তাহারা পীরের রূহের শনণাপন্ন হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাহাদের সহায়তা যাঞ্চা করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অধিকার শুধু আল্লাহর মালিকানা সত্বের বৈশিষ্ট্য বিপদ ও সংকট হইতে উদ্ধার করা একমাত্র তাহারই বিশেষত্ব।" আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, হে রাসূল (সাঃ) আপনি বলুন,

---

[৪৩৫] *আল এসলাম, চৈত্র ১৩২৪, ৩য় ভাগ, পৃ:৬২৮*

[৪৩৬] *আল এসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ:* ৬৩১,৬৩২

Dhaka University Institutional Repository

"কেবল আল্লাহ তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। তথাপি তোমরা শিরকের পাপে লিপ্ত হইতেছে"- আলকোরআন। ৬৪ আয়াত [৪৩৭]

এহেন ধ্যান ও ভক্তি সাধনের বিষয়ে শাইখুল মাশায়েখ বড় পীর আব্দু কাদের জিলানীর বক্তব্য তিনি তুল ধরেছেন। "আল্লাহ ব্যতীত অপরে রত হওয়া শিরক।" ফতহুল গায়েব ২২২ [৪৩৮]

পীরের ধ্যান সাধান বিষয়ে পীরপন্থীরা কবিতার চরণ উপস্থাপন করে যে প্রমাণ দিয়ে থাকে যেমন হাফীযের কবিতা, "হে হাফীয তুমি যদি নিরবচ্ছিন্ন মিলন কামনা কর. তাহলে প্রেমাস্বদের নিকট হতে অনুপস্থিত থেকোনা।"

সেসব কবির কল্পনা কোরআন, হাদীস, ইজমা এমনকি কিয়াছ সম্মত নয়। কবিতা যতই সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী এবং ভাবব্যঞ্জক হউক না কেন, উহার দ্বারা শরীয়তের মাছআলা মীমাংসিত হইতে পাবেনা। আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন. পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনসরণ করিয়া থাকে"-

আশশোআরা ২২৫ আয়াত।[৪৩৯]

তিনি বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে কবির নিম্নোক্ত কবিতাকে বিশ্লষণ করেছেন ঃ

" তোমাকে ছাড়া হে প্রিয়তম ভুল করিয়াও যদি আমার মনে অন্য কোন ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আমি মীমাংসা করিব যে আমি পথভ্রষ্ট।"

কিন্তু কথা এই যে, প্রিয়তম কে? আপনি বলিবেন- "পীরেছাহেব" কিন্তু আমি বলিব ঃ

والذين امنوا اشد حبا لله

আল্লাহ তাআলাই মুছলমানগণের সার্বপেক্ষা অধিক প্রেয়স- আল বাকারা।[৪৪০]

পরিশেষে তিনি প্রত্যয়দীপ্ততার সাথে বলছেন-"বড়ই আশ্চর্যের বিষয় পীরপরস্তরা বুখারী প্রভৃতির যে হাদীসছটি উল্লেখ করিয়েছেন তাহাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) (আমার প্রাণ তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত এবং

৪৩৭

পীরের ধ্যান, প্রকাশকাল ১৯৫৫, পাবনা, পৃঃ নং ১৫

৪৩৮

প্রাগুক্ত পৃঃ ং ১৬

৪৩৯

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, পীরের ধ্যান, পাবনা -১৯৫৫, ১৭ ও ১৮ পৃ

৪৪০

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহার উপর আল্লাহর পবিত্র আশীষ বর্ষিত হউক) আদেশ করিতেছেন, যে পর্যন্ত আমি প্রিয়তম না হইব। আর পীরপন্থীরা বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত পীর প্রিয়তম না হয়"।

পীর পরস্তদের দল কী মনে করেন এই রূপ কৌশল এবং তলবীছ (ধোকাবাজী) অবলম্বন করিলেই তাঁহারা মুছলমানদিগকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অনুরাগ ও মহব্বত হইতে ফিরাইয়া লাইয়া তাঁদের পীরের প্রেমের কুহকে মজাইতে পারিবেন?

-কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!!

যাও এ ফাঁদ অন্য পাখির জন্য পাও।

আনফা পাখীর নীড় বহু উচ্চে।[৪৪১]

ধর্ম চিন্তা ও সমাজ সংস্কার

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী বড় মাপের একজন রাজনীতিক হলেও তার আসল পরিচয় ছিল তিনি একজন বুজুর্গ আলেম ব্যাক্তি। রাজনীতির ডামাডোলে পড়ে তিনি কখনো ধর্মচিন্তা থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনি আবদ মস্তক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তাঁর সমুদয় কাজকর্শ ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। আব্দুল্লাহিল বাকীর রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কে মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে যথাযথই বলা হয়েছে,"কিন্তু তিনি রাজনীতি চর্চা করিতেন রাজনীতির জন্য নহে, ধর্মীয় কর্তব্যেরই

৪৪১

পীরের ধ্যান, পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গ হিসাবে। তাঁহার প্রত্যেকটি কাজের ভিতর ধর্মপ্রবণতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত।"[৪৪২] তার কুরআন তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত শ্রুতি মধুর যা শুনলে মনপ্রাণ ভরে যেত।[৪৪৩] তার ইসলামী বয়ান হতো অত্যান্ত তথ্য সমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল। তিনি প্রচলিত ধারায় ওয়ায়েজ ছিলেন না। তবে কোন ধর্মসভায় কখনো বক্তৃতা করলে শ্রুতাগণ তার বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হয়ে পড়ত। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ১৯০৭ সালে গাইবান্ধার খোলাহাটিস্থ প্রসিদ্ধ ফারসী বন্দরে এক বিরাট সভায় যোগদান করেন এবং বক্তৃতা করে সকলকে বিমোহিত করেন।[৪৪৪]

তিনি ওয়াজ নসিহত করে রাত কাটানোর চেয়ে জনসাধারণের হাতেনাতে ইসলামী তালীম ও প্রশিক্ষণে বিশ্বাসী ছিলেন।[৪৪৫] সেই লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন এলাকায় সফরে বের হতেন। তার সফরের এলাকাগুলো সবেশীর ভাগ সময়েই হতো রংপুর জেলার হারাগাছা, গাইবান্ধা, বগুড়া জেলার মহিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায়। এসব এলাকাতে তিনি বড় মাওলানা এবং তাঁর অনুজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী ছোট মাওলানা বলে পরিচিত ছিলেন।[৪৪৬]

আব্দুল্লাহিল বাকীর মনপ্রাণ ইসলামের কল্যাণে সদা ব্যাকুল থাকত। জীবনের শেষ পর্যন্তও তার চিন্তা জগতের পুরোটা জুড়েই ছিল ইসলামের সার্বিক উন্নতি। তিনি ছিলেন বৃটিশ বিরোধী ও পাকিস্তান আন্দোলনের অকুতভয় সৈনিক। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির সংবিধান কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রূপ লাভ করুক এটি আব্দুল্লাহিল বাকীর জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। এই জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টাও চালিয়েছেন। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে তার ধর্মচিন্তার সুতীব্র অনুভূতি যথাযথই লেখা হয়েছে,"পাকিস্তান অর্জনের পর প্রতিশ্রুতি অনুসারে উহাকে খালেছ ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র সত্ত্বাকে এই পূণ্য কর্যে নিয়োজিত করেন। আদর্শ প্রস্তাব ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে কোরআন ও হাদীছকে যে আসন দেওয়া হইয়াছে উহার অনেখানি কৃতিত্ব মাওলানা মরহুমেরই প্রাপ্য। দেহের আরাম, মনের শান্তি, পারিবারিক সমৃদ্ধি, সংসারের উন্নতি সবকিছু বিসর্জন দিয়া দেশ ও মিল্লাতের চিন্তায় এবং নিরলস কর্মসাধনায় তিনি নিজেকে তিলে তিলে

---

[৪৪২] *তর্জুনামুল হাদীস, ৩য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ:৪৬৯*

[৪৪৩] *তিন পুরুষ, পৃ:৮*

[৪৪৪] *আল্লামা আব্দুল্লাহিল বাকী রহ: সংক্ষিপ্ত জীবনী, আব্দুল হাদী মুহাম্মদ আনওয়ার, পৃ:২*

[৪৪৫] *আব্দুল্লাহিল বাকীর ছোট ছেলে আনোয়ার আল হাদীর সাক্ষাৎকার থেকে উদ্বৃত*

[৪৪৬] *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বিলাইয়া দেন। জীবন সায়াহ্নে তাহাকে একটি কথা বহুবার বলিতে শুনিয়াছি- যাহা বার বার কানে বাজিয়া উঠে- "যে কয়টি দিন বাঁচিয়া আছি, কোরআন ও হাদীছের প্রকিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িয়া যাইব, কোরআন ও ছুন্নাহর শাসন কায়েম করার জন্য জীবনপাত করিব, এই জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি এবং এই জন্যই মরিতে চাই।"[৪৪৭]

তাঁর জীবন যৌবন সবই যে তিনি ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে মাসিক তর্জামানুল হাদীসে লেখা হয়েছে,"তিনি ছিলেন ইছলাম নিবেদিত প্রাণ। ইছলামের দুর্দশায় তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিত। মুছলমানদের সর্বাধিক উন্নতি যে ইছলামের তথা কুরআন ও হাদীছের পুন:প্রতিষ্ঠার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নিভর্রশীল একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। যে কোন আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন- এই মূল কথাটি কস্মিনকালে বিস্মৃত হন নাই।"[৪৪৮]

মাওলানা বাকী তার সাংগঠনিক ভূমিকার পাশাপাশি একজন শক্তিমান লেখকও ছিলেন। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ যখন পীরদের কাছে মাথা নত করে করজোড়ে ভক্তি জানাত ঠিক তখন তিনি এই ধর্মের নামে অধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি পীরের ধ্যান নামক পুস্তকে পীর মুরীদীর প্রচলিত ভ্রান্তির ব্যাপারে বলিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। পৃথিবী পরিচালনা পীরদের হস্তক্ষেপ, ভালমন্দ করতে পীরদের ক্ষমতা এবং ভূত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান পীরদের রয়েছে অজ্ঞ জনসাধারনের এমন কুসংস্কারচ্ছ ধারণার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন,"এই সকল বিশ্বাস পীরপূজকদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ স্বরূপ শুধু এই কথাই উল্লেখ করা যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা যখনই কোন বিপদে পতিত হয় অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্রতী হয় , তখন তাহরা পীরদের রূহের শরণাপন্ন হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁহাদের সহায়তা যাঞ্চা করিয়া থাকে। কিন্ত এরূপ অধিকার শুধু আল্লাহর মালিকানা স্বত্বের বৈশিষ্ট, বিপদ ও সংকট হইতে উদ্ধার করা একমাত্র তাহারই বিশেষত্ব। আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, হে রসূল (সাঃ) আপনি বলুন,"কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তথাপি তোমরা শিরকের পাপে লিপ্ত হইতেছ" আল আনআম, আয়াত:৬৪।"[৪৪৯]

---

[৪৪৭] *মাসিক তর্জামানুল হাদীস, পৃ:৪৭০*

[৪৪৮] *মাসিক তর্জামানুল হাদীস,৩য় বর্ষ, ১১-১২ শ সংখ্যা, ১০৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ:৪৬৯-৭০*

[৪৪৯] *পীরের ধ্যান, ডিসেম্বর-১৯৫৫, পাবনা, পৃ:১৫*

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহিল বাকী তার অন্যান্য লেখনীর মাধ্যমে সমাজের মানুষের অন্ধকার দিকটির উম্মুচন করেছেন। সেই সাথে ঘরে বাইরে এমনকি স্থানে স্থানে গমন করে কুরআন হাদীস ও আধুনিক শিক্ষার আলোকে জনগণকে কুসংস্কার মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আহলে হাদীস আন্দোলনে মাওলানা বাকী

Dhaka University Institutional Repository

পিতার উত্তর সূরী হিসেবে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আহলে হাদীস মতানুসারী হলেও আহলে হাদীস মতাদর্শের সাথে নিতি মনপ্রাণ জড়িয়ে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে তিনি ছিলেন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকার এক স্মরণিকা সংখ্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর আহলে হাদীস সম্পৃক্ততার কথা এভাবে লেখা হয়েছে-"আহলে হাদীস মতবাদ তথা কুরআন ও সুন্নাহর অবিকৃত শিক্ষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং উহার প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টার জন্যই তাঁহার বুজর্গ পিতা মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল হাদী আল কোরায়শী স্বীয় জন্মভূমি চট্টগ্রামের যাবতীয় আকর্ষণ এবং আপনজন ও আত্মীয় স্বজনের মায়ামমতার শতবাধা ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। এই ত্যাগ-পূত, ত্যাগ-বুদ্ধ, ও সুন্নাত নিষ্ঠ পিতার যোগ্য পুত্ররাপে মাওলানা মরহুম নিজেকে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন আর দেশ ও সমাজ সেবায় জনসমাজে তদাপেক্ষা অধিক যশোঃগৌরব ও খ্যাতি অর্জন করেন।"[৪৫০]

এই প্রসঙ্গে পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছে-

মাওলানা বাকীকে তাঁর পিতার মৃত্যুর (১৯০৬) পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গের আহলে হাদীছ জামাআতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়।[৪৫১]

তিনি আহলে হাদীছ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় আসনে থেকে এর অগ্রযাত্রায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এই প্রসঙ্গে তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছে, "তিনি বগুড়ায় এবং রংপুর জিলার হারাগাছে যথাক্রমে বগুড়া জিলা ও উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস কনফারেন্সদ্বয়ে সভাপতির আসন অলকৃত করেন। অধুনালুপ্ত আঞ্জুমানে আহলে হাদীসের সহিত ও তাঁহার সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ ও সহানুভূতিপূর্ণ। ১৯৪৫ সনে হারাগাছের নিখিল ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্স স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এবং নানারুপভাবে পরামর্শ দিয়া নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের গোড়া পত্তনে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত জমঈয়তের ওয়ার্কিঙ কমিটির সদস্য থাকিয়া, জমঈয়তে অর্থ উপদেশ ও নানভাবে কার্যকরী সাহায্য প্রদান করিয়া এবং উহার বিভিন্ন সভায় যোগদান করিয়া কর্মীদের অন্তরে উৎসাহের সবার করিয়া আর জমঈয়তের মুখপাত্র তর্জুমানুল হাদীসের প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যপক প্রচারোনায় নানাভাবে সহায়তা করিয়া তিনি

---

৪৫০ *তর্জুমানুল হাদীছ, ৩য় বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা*

৪৫১ *ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ২৬০*

Dhaka University Institutional Repository

গোটা জামাআত তথা কোরআন ও হাদীসের প্রতিষ্ঠাকামীদিগকে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া যান।[৪৫২]

আহলে হাদীস জামায়াতের খেদমতে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন্ তিনি তার মেধা যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অপার মহিমা দিয়ে আহলে হাদীছ জামাআতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অসীম ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আহলে হাদীছ জামাআতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুজনিত শূন্যতার কথা তুলে ধরে মাসিক তর্জুমানুল হাদীছে স্মরণিকা সংখ্যায় যথার্থই লেখা হয়েছিল,

"বস্তুত তাঁহাকে আকস্মিভাবে হারাইয়া আহলে হাদীছ জামা'ত আজ ইয়াতীমে পরিণত হইল, জমঈয়ত উহার প্রেরণার উৎস ও শক্তির স্তম্ভ খোয়াইয়া বসিল। অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও এই বিপুল ক্ষতি পূরণের কোনই সম্ভাবনা নেই।"[৪৫৩]

আহলে হাদীস জমঈয়তের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তিনি এই জমঈয়তের কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজে যারপর নাই কতর্ব্য নিষ্ঠ ছিলেন। তার মৃত্যুকালীন সময়কালে ৪ঠা ডিসে, ১৯৫২ তাং জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভায় ও পরবর্তী দুইদিন জমঈয়ত কর্তৃক আয়োজিত অজিমুস শান তাবলীগ ইসলাম সম্মেলনে তার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার কথা ছিল। তার পূর্বে তিনি নিজ বাড়ীতে অসুস্থ্য হয়েে পড়লেও এই মন্তব্য করেন "আমি যেতে নাপারলেও আমার লাশ পাবনায় যাবে" মৃত্যুদিন ও তার মুখ থেকে পাবনার সভার কথা উচ্চারিত হতে থাকে।[৪৫৪]

সমসাময়িক মনীষীগণ ও মাওলানা বাকীর তুলনা

৪৫২

মাসিক তজুমানুল হাদীস ৩য় বর্ষ ১২শ-১২শ সংখ্যা ১৯৫২ সন, পৃঃ ৪৬৮

৪৫৩

মাসিক তজুমানুল হাদীস ৩য় বর্ষ ১২শ-১২শ সংখ্যা ১৯৫২ সন, পৃঃ ৪৬৮

৪৫৪

প্রাগুক্ত-পৃঃ ৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ,ধর্মশাস্ত্রবিদ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর চেতনা ও কর্মের সাথে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর মিল ও ঐক্য বলতে গেলে একশত ভাগ ছিল। এমনকি যে কয়জন ধর্মশাস্ত্রক মাওলানা রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে আপন দেশ ও জাতির ভাগ্য পুনর্নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে এদুজন ছিলেন অগ্রগামী। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে' যোগদানের মধ্য দিয়ে আকরম খাঁর জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।[৪৫৫]

মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমাজ ও জাতির সেবায় সাংবাদিকতা অবলম্বন করেন। ১৯০৬-এ তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯১৪, মতান্তরে ১৯১৫ সাল মোতাবেক ১৩২২-২৩ সনের বৈশাখ মাসে আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্র হিসেবে আল-এসলাম নামক আরও একটি মাসিক পত্রিকা মাওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বীয় সম্পাদনায় ১৯২০ -এ উর্দু দৈনিক 'জামানা' ও ১৯২১-এ দৈনিক 'সেবক' প্রকাশ পায়।[৪৫৬]

তাঁর সাংবাদিক জীবনের অমর কীর্তি 'দৈনিক আজাদ' (৩১ অক্টোবর ১৯৩৬) প্রকাশ ও সম্পাদনা। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমানদের রাজনেতিক, অর্থনৈতিক , সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষায় আজাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগষ্ট ১৯৪৭) পর আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর হয়।[৪৫৭]

---

৪৫৫ *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ,তৃতীয় সংস্করণ;২০০৯ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ: ২৫২*

৪৫৬ *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ: ৩০৯*

৪৫৭ *প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৯*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সালে উপমহাদেশের রাজনীতি স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে রূপান্তরিত হরে তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক কমরেড পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৪৫৮] মাওলানা আকরম খাঁ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে লীগ কংগ্রেসের যুক্ত আন্দোলন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ আন্দোলন প্রত্যেকটিতে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন। এছাড়া খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও (১৯১৯-১৯২২০ মাওলানা আকরম খাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[৪৫৯] 'সেবক' পত্রিকায় 'অগ্রসর' নামে শিরোনামে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে এক উত্তেজনাকর সম্পাদকীয় লেখার দায়ে গ্রেফতার (১৯২১) হন। এক বছর কারাদণ্ড লাভের পর মুক্তি লাভ (১৯২২) করেন।[৪৬০] তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির (১৯২৯) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪১-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪৬১] সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা অকরম খাঁ মুসলমান সমাজের অগ্রদূত।[৪৬২] বাংলা সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় কীর্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবনী 'মোস্তফা চরিত' এবং পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ 'তাফসীরুল কুরআন'। 'সমাজ ও সমাধান''মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫) 'মুক্তি ও ইসলাম' তাঁর অপরাপর গদ্যগ্রন্থ।

৪৫৮

বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান, আবুল কালাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ; জুন ২০০৯, পৃ: ২৭

৪৫৯

বাংলা জীবনীকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৯

৪৬০

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ: ৩০৯

৪৬১

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, শামসুজ্জামান চৌধুরী ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ: ৩০৯

৪৬২

ওহদিুল হক ও ডঃ মাহবুবুল হক সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীও মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন ও ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। সেই লক্ষ্যে উভয়কেই আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেও দেখা যায়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষা জীবনে ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। পরবর্তীতে ভাষা বিজ্ঞানে পি. এইচ. ডি লাভ ও ১৯২৮ সালে প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনন্য সম্মান সূচক ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ এর ২জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ১৯৬০ সালের ১ জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমীর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। একই সময়ে পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

'আঙুর' (শিশু পত্রিকা, ১৯২০), ইংরেজী মাসিক 'দি পীস' (১৯২৩), মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গভূমিক' (১৯৩৭), পাক্ষিক পত্রিকা 'তকবীর' (১৯৪৭) সম্পাদনা করেন।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পরপরই দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে এবিতর্ক সৃষ্টি হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর এ ভূমিকার ফলে বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়।[৪৬৩] মাতৃভাষা বাংলার প্রশ্নে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীকেও সংগ্রামী ও চেতনাদীপ্ত হয়ে একাত্ম হতে দেখা যায়।

৪৬৩

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ: ৩০০-৩০১

Dhaka University Institutional Repository

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী ছিলেন জননেতা আবুল মনসুর আহমদ। আবুল মনসুর আহমদ ১৯২১ সালে কলকাতার রিপন ল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি এল পাশ করে সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ছোলতান, মোহাম্মদী, দি মুসলমান, খাদেম, দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহসম্পাদক ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬৪]

তিনি রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত স্বরাজ দলের অন্যতম কর্মী ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আবুল মনসুর আহমদের মতো মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর রাজনেতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পথ চলা ছিল অভিন্ন। কৃষক-প্রজা পার্টিতে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আবুল মনসুর আহমদ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রজা দরদী নেতারা এক কাতারে এগিয়ে চলেছেন। কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা এবং মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামীলীগের সহ সভাপতিও ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচী ২১-দফার অন্যতম প্রণেতা ছিলেন। ১৯৫ তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫তে আওয়ামীলীগের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৫৬ তে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, ১৯৫৬-১৯৫৭ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী

৪৬৪

বাংলা জীবনীকোষ , পৃ: ৮১)

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীসভার শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৮-১৯৬২ সাল পর্যন্ত কারাবরণ করেন। এরপর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৬৫]

সাহিত্য ক্ষেত্রে জনাব আবুল মনসুর আহমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিশোর সাহিত্য,উপন্যাস, রাজনীতি বিষয়ক রম্য রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। বঙ্গ সাহিত্য রচনায় তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮) ইত্যাদি উপন্যাস; আয়না (১৯৩৫), ফুড কনপারেন্স (১৯৪৪), আসমানীপর্দা (১৯৬৯) শীর্ষক গল্পগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২) উল্লেখযোগ্য। তিনি ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০) পেয়েছেন। মৃত্যু ১৮ মার্চ ১৯৭৯, ঢাকায়।[৪৬৬]

---

৪৬৫ *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ: ৫৯*

৪৬৬ *বাংলা জীবনীকোষ, পৃ: ৮২*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী (১৯০০-১৯৬০)

একই বাবা মায়ের সন্তান মাওলানা আবদুল্লহিল বাকী ও মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী ছিলেন একই বৃন্তে ফোটা দুটি গোলাপের মতো। চিন্তা- চেতনা, শিক্ষা-সাধনা ও লক্ষ্যস্থল নির্ধারণএ সব কিছুতেই এ দুভায়ের অসম্ভব মিল। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজ বি. এ পড়ার সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন এবং বৃটিম বিরোধী ক্রিয়া কর্মে যোগ দেন।[৪৬৭]

এই সময়ে 'আলহেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদের সংসর্গ লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির পক্ষে থেকে ঢাকায় আগমন। পরবর্তী কালে কলকাতায় ফিরে মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত খেলাফত কমিটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা' 'জামানা'-র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে এ পত্রিকার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক' গ্রেফতার হলে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন।

সাহিত্য সাধনায় ভ্রাতৃযুগল একইলক্ষ্যাভিসারী ছিলেন। মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করে তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে এবং ইসলামের বিশুদ্ধ মর্মবাণী জাতির কর্নকুহরে পৌছে দিতে উভয়ে পায়ে পায়ে সমান তালে এগিয়ে চলেছেন। ১৯২২ সালে জমায়াতে উলামায়ে বাংলার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তৎকর্তৃক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যগ্রহী' প্রকাশ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী হিসেবে ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টির সংগঠন ও প্রচারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। ঐ দলের সেক্রেটারির পদে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬৮]

---

৪৬৭ *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকাপৃ: ১৫৯*

৪৬৮ *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ: ৩১২*

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২ সালে মাওলানা কাফী 'জমিয়ত-এ- উলামা- এ-হিন্দ'-এর বাংলা শাখার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২২-২৪ সালে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াহ্হাব 'নাবীনা' ও বেনারসের মুহাদ্দিস আবুল কাসেমের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাওলানা কাফী কংগ্রেস-পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩৩ খৃঃ) যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে দুইবার কারাবরণ করেন। অনুজ আবদুল্লহিল কাফীর মত মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীও দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে বার বার ক্ষমতাদর্পী বৃটিশদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে নির্যাতিত হন। প্রথমবার ১৯৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁয়ে বক্তৃতা করার দায়ে গ্রেফতার হন এবং এক বছর কলকাতার সেন্ট্রাল জেলে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। মুক্তি লাভের পর তাঁর উপর আরোপিত ১৪৪ ধারা ভংগ করে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা করায় আবার গ্রেফতার হন এবং কলকাতার দমদম জেলে ৬ মাস কারাবরণ করেন।

১৯৪২ সারে তিনি হজ্জ্ব করেন। হজ্জ্বের পর তিনি দেশে ফিরে সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচার ও আহলে হাদীস জামায়াতের সংস্কার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি আহলে হাদীস জামায়তের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত হন এবং প্রাদেশিক ও উপমহাদেশীয় বিভিন্ন আহলে হাদীস কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১৯৪০ সালে মাওলানা কাফীর সভাপতিত্বে পাবনা জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স এবং ১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে 'নিখিল বংগ ওআসাম আহলে হাদীস' এবং তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। 'জমিয়তের' সদর দফতর ছিল কলকাতায়। ১৯৪৮ সালে ঐ দফতর পাবনা শহরে স্থনান্তিতির হলে মাওলানা কাফী পাবনায় এসে বসবাস করতে থাকেন।[৪৬৯]

রাজনীতির পাশাপাশি আহলে হাদীস আন্দোলনে আবদুল্লাহিল কাফীর সাথে যুথবদ্ধ হয়ে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীও দৃঢ়পদে এক যোগে কাজ করেছেন।

---

৪৬৯ *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, পৃ: ১৬০-১৬১*

Dhaka University Institutional Repository

মনীষীগণের দৃষ্টিতে মাওলানা বাকী

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী যে সকল মন্তব্য করেছেন তাতে অনেকাংশেও তার ব্যক্তি সত্বার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। প্রক্ষ্যত শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ আব্দুল্লাহিল বাকীর গুণীপনা ও জীবনাচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

"মাওলানা বাকী সাহেব অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ষোল আনা বিশ্বাস নিয়েই তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই যে তিনি খদ্দারের কাপড় পড়া শুরু করেছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সে ব্রত ঠিক রেখেছিলেন। তার সেই ধবধবে অনাড়ম্বর পেষাক, হাস্য-উজ্জল পিয়ারা মুখচ্ছবি, পান্ডিত্বমন্ডিত আলাপ আলোচনা, মেজাজের নিবিড় মাধুর্য, চরিত্রের অনাবিল লাবণ্য, মানুষ প্রীতি-ভক্তিতে স্বভাবতই তার দিকে ঝুকে পড়ত।"[৪৭০]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর কর্মময় জীবনের প্রায় পুরো অংশ ব্যাপী দেশের আদর্শবাদী জাতীয় নেতাদের সম্মুখ সারিতে থেকেই কাটিয়েছিলেন। সে জন্যই দেখা যায় মাওলানা বাকীর মৃত্যুতে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক দৈনিক আজাদ সম্পাদক মাওলানা আকরাম এক শোক বাণীতে লিখতেছেন,

"আমার চিরদিনের সুহৃদ ও সহকর্মী জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেবের আকস্মিক এনতেকালের সংবাদে আমি যে দারুন আঘাত পাইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা বস্তুতই আমার পক্ষে অসম্ভব। দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ ঘনিষ্ঠতা অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী কর্মজীবনে পরস্পরের সাহচর্য এভং উভয়ের ভাবগত ও আদর্শগত অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ইতিহাস, আজ একে একে স্মৃতিপথে জাগ্রত

[৪৭০] *বতোয়ন, ইবরাহীম খাঁ, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস: ঢাকা প্রথম প্রকাশ, জুলাই,১৯৬৭, পৃ:৪২১*

Dhaka University Institutional Repository

হইয়া উঠিতেছে এবং মন ও মস্তিষ্ককে ক্রমশ অধিকতর অবসন্ন করিয়া তুলিতেছে।"[৪৭১] পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি জনাব তমিজুদ্দীন খান মাওলানা বাকী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,"মধুর ব্যবহার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্পষ্টবাদিতা তাঁহাকে পাক-ভারত উপমহাদেশে সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।"[৪৭২] পাকিস্তানে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মি: সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মাওলানা বাকীর জীবনাচার সম্পর্কে বলেন, "সে যুগের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অনেকেই খদ্দরের ব্যবহার ত্যাগ করিলেও মাওলানা বাকী আজও পর্যন্ত খদ্দর পরিধান করিতেন।"

ঐতিহাসিক মেহরাব আলী মাওলানা বাকী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ বস্তত- জগতে অনেক ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনো আছেন 'সোনার চামচ' মুখে দিয়া যাহাদের জন্ম হইয়াছে। দিনাজপুরের মৌলনা আব্দুল্লাহিল বাকী তেমনি একজন সৌভাগ্যবান রাজনীতিক, যাঁহার জন্ম হইয়াছিল নেতৃত্ব দন্ড হস্তে ধারণা করিয়া। অসাধারণ সূক্ষ্ম বিচারক-বুদ্ধিসম্পন্ন, নির্ভীক চিত্ত-শক্তির অধিকারী তীব্র কূটনীতি জ্ঞানসম্পন্ন এবং চরম অভিজাতমনা মৌলানা বাকী যেদিন হইতে জেলা মুসলিম লীগে যোগদান করেন, সেই দিন হইতে এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত লীগ-পরিচালকবৃন্দের আসন ও বসন যেন আলগা হইয়া যায়। তাঁহার রাজনৈতিক চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি কোন সঙ্কটময় পরিস্থিতির কবলে পড়িয়াও ঘাবড়াবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন ছিল একটানা ও গৌরবময় এবং তিনি ছিলেন দিনাজপুরের রাজনৈতিক জাগরণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। মাওলানা বাকীর মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর সম্বন্ধে দৈনিক সংবাদে লেখা হয়েছিলঃ

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃভূমি ও ইসলামের সেবা করিয়া মাওলানা বাকী দেশবাসীর পরমাত্মীয় হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক সেনাপতি, প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী ও আদর্শ দেশপ্রেমিক।[৪৭৩]

দৈনিক মিল্লাতের সম্পাদকীয়তা মাওলানা বাকীকে পাকিস্তানের অন্যতম রাজনীতিক ও আলিমরূপে উল্লেখ করে লেখা হয়ঃ

ভারতের বুকে সংগঠিত প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনই মাওলানা বাকী পুরুষ-সিংহ মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী প্রমুখের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে

---

[৪৭১] *মাসিক তর্জামানুল হাদীস,৩য় বর্ষ, ১১-১২ শ সংখ্যা, ১০৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ:৪৭৭*

[৪৭২] *প্রাগুক্ত, পৃ:৪৭৮*

[৪৭৩] *আরাফাত, ঢাকা, ১৩ অগ্রাহায়ণ ১৩৮৯, ২৯ নভেম্বর, ১৯৮২*

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনতার জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেন। মরহুম কায়েদে আজমের নেতৃত্বে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংগঠনে যে আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠে, তার পশ্চাতে এই প্রৌঢ় থ্যাগী কর্মবীরের নিরলস সাধনা অপরিমিত প্রেরণা যুগিয়েছিল। পাকিস্তান কায়েমের পর যখন চারিদিক হতে প্রতিকূলতার ঝঞ্ঝায় রাষ্ট্রের তরী টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, তখনো মরহুম কায়েদে আজম, মরহুম কায়েদে মিল্লাত প্রমুখের সংগঠনী হস্তকে দৃঢ়তর করার জন্য দেমপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই আজীবন সংগ্রামী কর্মী এগিয়ে আসেন এবং দেশ ও কওমের স্বার্থে পরিণত বয়সেও দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার বিনাসংকোচে গ্রহণ করেন। গণপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হিসেবে, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান দেশবাসী বিস্মৃত হবে না।[৪৭৪]

দৈনিক আজাদের মূল্যায়ন ছিল

তিনি শুধু আলেম ও সাহিত্যসেবীই ছিলেন না, রাজনৈতিক ও সমাজসেবী হিসাবেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।..... আঞ্জুমানে বাংলার মাধ্যমে এ দেশে যে সমাজনৈতিক আন্দোলন জেগে উঠেছিল তাতে তিনি যেমন একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তী খেলাফত আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন এবং পরিশেষে পাকিস্তান আন্দোলনেও তেমনি নেতৃস্থানীয়দের পুরোভাগে সক্রিয় ছিলেন।..... এমন একাধারে আলেম, পন্ডিত, রাজনীতিক, সমাজনীতিক, স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণ ব্যাক্তি আমাদের দেশে খুব বেশী নাই।[৪৭৫]

মর্নিং নিউজে লেখা হয়

[৪৭৪] *প্রাগুক্ত, উদ্বৃত রাজনীতি বঙ্গীয়, পৃ:১৪৬*

[৪৭৫] *প্রাগুক্ত, উদ্বৃত রাজনীতি বঙ্গীয়, পৃ:১৪৬*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর চরিত্র আচরণ এবং কর্ম দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ বজায় রেখেও রাজনীতির চর্চা অবাধে চলতে পারে। প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ মওলানা বাকী সম্পর্কে বলেনঃ

মওলানা বাকী সাহেব অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ষোলআনা বিশ্বাস নিয়েই তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই যে তিনি খদ্দর কাপড় পরা শুরু করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি পরম নিষ্ঠার সংগে সে ব্রত ঠিক রেখেছিলেন। তাঁর সেই সাদা ধবধবে অনাড়ম্বর পোষাক, হাস্য-উজ্জ্বল পিয়ারা মুখচ্ছবি, পান্ডিত্যমন্ডিত আলাপ-আলোচনা, মেজাজের নিবিড় মাধুর্য, চরিত্রের অনাবিল লাবণ্যে মানুষ প্রীতি-ভক্তিতে স্বভাবতই তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তো।

মর্নিং নিউজ পত্রিকা মাওলানা বাকীর মৃত্যুতে এক শোক সম্পাদীয়তা যে মন্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে মাওলানা বাকীর সাফল্যময় জীবনের কীর্তিগাথা সংক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে, লেখা হয়েছে,"মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ছাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মরু হইতে আমাদের অন্যতম জাতীয় নেতা চিরদিনের জন্য অপসারিত হইলেন। জনাব মাওলানা সাহেব একজন পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তাহার চরিত্র আচরণ এবং কর্ম দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াও রাজনৈতিক চর্চা অবাধে চলিতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং আইন পরিষদের সক্রিয় ও সম্মানিত সদস্য হিসাবে তিনি প্রদেশের পাবলিক ও পার্লামেন্টারী জীবনে যথেষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়েছিলেন।"[৪৭৬] ইহা দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি তাহার সহানুভূতির পরিচায়ক।[৪৭৭]

ভাষা বিজ্ঞানী ড. মোঃ শহীদুল্লাহ মাওলানা বাকীর মৃত্যুতে যে শোকবানী দিয়েছিলেন তাতেই মাওলানার প্রতি ড. মোঃ শহীদুল্লাহর যে উচ্চ আসন ছিল তা প্রমাণিত হয়, তিনি লিখেছিলেন,"মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মৃত্যুকত 'মউতুল আলেমে মউতুল আলম- আলেমের (বিদ্বানের) মৃত্যুতে আলমের জগতের মৃত্যু'- বাক্যের সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। গত প্রায় ৪০ বৎসর হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। আঞ্জুমানে ওলামা-এ বাঙ্গালার সম্পর্কে

[৪৭৬] *উদ্বৃত, মাসিক তর্জামানুল হাদীস, পূর্বোক্ত, পৃ:৪৮৬*

[৪৭৭] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭৯*

Dhaka University Institutional Repository

সে পরিচয় গাঢ় হয়। তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ আল-ইসলাম, মাসিক মোহাম্মদী এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন।"[৪৭৮]

এছাড়া অনেক জ্ঞানী গুণী সুধীজন মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সম্বন্ধে উচ্ছসিত প্রশংসা ও চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন।সমাজে তদপেক্ষা অধিক যশোঃগৌরব ও খ্যাতি অর্জন করেন।[৪৭৯]

ব্যক্তিসত্বা,স্বভাব ও চরিত্র মাদুর্য্য

মাওলানার উচু ব্যাক্তিসত্ত্বা ও সুন্দর অবয়ব সম্পর্ক লিখেছেন তার কন্যা সৈয়দা সাবেরা মাসউদ বলেন, "আমার আব্বাজান ছিলেন এক সৌম্যদর্শন, প্রতিভাবানযোগ্য অসাধারণ ব্যাক্তিসম্পন্ন ব্যাক্তি। আল্লাহর দেয়া অপূর্ব রশ্মি ছিল তাঁর চেহারায় তার দিকে তাকালেই ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসতো।"[৪৮০]

তার চরিত্র সুষমার উচ্চকিত বর্ণনা ফুটে উঠেছে তৎকালীন নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছের সেক্রেটারীর লেখায় তিনি লিখেছেন-"তাঁহার সৌজন্যমূলক আচরন, চিত্তাকর্ষক ব্যবহার মধূর ব্যবহার ভাষণ, দরদী দেল, সহানুভূতিশীল হৃদয় প্রত্যেকেই মুগ্ধ করিত। তাঁহার কাছে বসিলেই এমনকি সুর্দশন চেহরাটি দেখিলেই ভক্তিতে স্বস্ফুত ভাবে হৃদত্ত আপ্লুত এবং শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া আসিত।" বস্তুত পন্ডিত্যের সহিত বিনয়ের এলেমের সহিত আমলের, ধীশক্তির সহিত যুক্তির চিন্তার আমলের বাস্তবের, ধর্মীয় যোশের সহিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এবং গাম্ভির্যের সহিত তদীয় কন্যা তার পিতা মাওলানা বাকর দানশীলতা ও বদান্যতার কথা তুলে ধরেন এভাবে- "মৌলনা সাহেবর বাড়িতে দানের খূব মর্যাদা ছিল। আব্বাজান কখন ও গরীব দুঃখীকে ফেরাতেন না। এমনিতেই মৌলানা সাহেবের মসজিদ এসে উঠলে সবার থাকা খাওয়া ফ্রি ছিল। সে যতজনই

---

[৪৭৮] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭৯*

[৪৭৯] *তর্জুমানুল হাদীছ, ৩য় বর্ষ, ১১-১২শ*

[৪৮০] *আমাদের তিন পুরুষের ঐতিহাসিক গৌরবময় জীবন কাহীনি সৈয়দা সাবেরা মাসউদ, ঢাকা ২০০৩ জুলাই পৃঃ ৫*

Dhaka University Institutional Repository

হোক।[৪৮১] রমযান মাসে স্বীয় পিতার বিশেষ দানশীলতার কথা তুলে ধরে তিনি আরও লিখেন- আব্বাজান রমযান মাসে ডবল দান করতেন। রোযার মাঝে আমাদের মসজিদে সবাইকে ইফতার খাওয়ানো হতো। আব্বাজান রোজার একুশ, তেইশ, পঁচিশ অথবা সাতাশ তারিখে গরু-খাশী জবাই করে জিয়াফত করে সবাইকে খাওয়াতেন এবং গরীব মিসকিনদের কাপড় বিতরণ করতেন।[৪৮২] রস প্রিয়তার এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।[৪৮৩] তিনি ছিরেন পরপোকারী ও অন্যের প্রতি যার নেই সহানুভূতিশীল। মাওলানা পুত্র আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার তার পিতা লিখেছেন "যে কেউ তাঁর নিকট এলে তিনি তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করতেন, তাকে সঠিক পরামর্শ দিতেন। সম্ভব হলে কাজ করে দিতেন এবং শেষ তাকে আপ্যায়ন করে হাসি মুখে বিদায় দিতেন।"[৪৮৪] মোট কথা মানবীয় উত্তম স্বভাব চরিত্র মাধূর্যের সর্বোত্তম সমহার ঘটেছিল মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর ব্যক্তি জীবনে।

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মৃত্যু এবং পরবর্তী শোক ও প্রতিক্রিয়া

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর শোকাবহ মৃত্যুও একটি ধারাবাহিক বিবরণ তাঁর কন্যা সৈয়দা সাবেরা মাসউদের লেখনিতে এভাবে উঠে এসেছে- " সেটা ছিল ১৯৫২ সালের শেষ দিকের কথা। আব্বাজান কর্মপলক্ষে করাচী গেলেন। ফিরে এলনে কদিন পর। আমরা সবাই আব্বাজানকে ঘিরে দাঁড়ালাম। মা জিজ্ঞাসা কেমন আছেন? আব্বজান উত্তর দিলেন, আমি মরতে ধরে ছিলাম.....মিলিটারী কর্ণেল ডাঃ তাকে আসতে নিষেধ করেছিলেন তাও বললেন বাড়ী আসার তৃতীয় দিন রাতে দশটা পর্যন্ত উনি মিটিং করলেন। ঐ রাতেই তার উঠে গেল বুকের ব্যাথ্যা।

৪৮১

আমাদের তিন পুরুষের ঐতিহ্যময় গৌরবময় জীবন কাহীনি, সৈয়দা সাবেরা মাসউদ, জুলাই-২০০৩ ঢাকা, পৃঃ ৬

৪৮২

প্রগুক্ত, পৃঃ ৬

৪৮৩

তজূমানুল হাদীস, ৩য় বর্ষ ঃ ১১শ-১২শ সখ্যা, আল্লামা মরহুম স্মরণে, ১৯৫২ সাল পৃঃ ৪৭০-৪৭১

৪৮৪

আল্লামা আব্দুল্লাহিল বাকী রাহঃ, সংক্ষিপ্ত জীবনী আব্দুল হাদী মুহাম্মাদ আনওয়ার, প্রথম সংস্করণ ২০০৬ দিনাজপুর, পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি করাচিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাড়াতাড়ি নিজের মিটির বাড়িতে ফিরে আসেন। এখানে এলে আবার করোনারী থেলাকায়াসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন হয়ে পড়েন।[৪৮৫] অস্থিরভাবে রাতটা কেটে গেল। পরদিন ডাক্তার এল.....পঞ্চম দিন দিনাজপুর থেকে সিভিল সার্জন এবং পূর্তমন্ত্রী জনাব হাসান আলী সাহেব তাকে দেখতে এলেন। সিভিল সার্জন তাকে ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে গেলেন এবং ব্যাথ্যা বেশি হলে মারফিয়া দেয়ার ব্যবস্থার করে গেলেন। ৬ষ্ঠ দিন সকালে আব্বজান আমাদের সবাইকে ডাকলেন। আমরা পাঁচ ভাই-বোন আর মা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর কাছ দাঁড়ালাম। .....বলেই আব্বাজান কেঁদে ফেললেন। তার কাঁদা দেখে আমরা সবাই কাঁদছি।[৪৮৬] তিনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ না করে উঠে বাথরুম করতেন। ১লা ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে বিকাল ৩টার দিকে বাথরুম করার সময় তিনি পাশে। সঠিক ড্রাগ ছিল না। তাই তাকে মরফিন এট্রোপিন ইনজেকশন দিয়ে বেহুশ করে রাখা হয়।[৪৮৭] পড়ে ধরাধরি করে আব্বাজানকে উঠিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সাথে সাথে ডাঃ এল একটা ইনজেকশনও দিল। একটু নিঃশ্বাসের শব্দ হলো। তারপর সব নিস্তব্দ, সব শেষ! ইন্নালিল্লাহ্, নূরুল হুদার নূর চিরদিনের জন্য এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব। সেইদিন ছিল ১৯৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বিকেল চারটা।[৪৮৮]

তাঁর মৃত্য সংবাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মাসিক তজুমানুল হাদীসে লেখা হয়েছে-"১লা ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় এই দুঃসংবাদ রেডিও পাকিস্তানে মারফত প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে সমগ্র দেশের উপর দিয়ে শোকের প্রচন্ড ঝড় বহিয়া যায়। হরতাল প্রতিপালন, শোক সভার শোক অনুষ্ঠান, তারাবার্তা, বিবৃতি ও চিঠি পত্রের মারফত দেশের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনসাধারণ তাঁহাদের হৃদয়ের স্বঃনিঃসারিত বেদনা প্রকাশ এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদা

---

৪৮৫ *সংক্ষিপ্ত জীবনী, আনওয়ার, পৃ. ০৮*

৪৮৬ *সৈয়দা সাবেরা মাসউদ, আমাদের তিন পুরুষের ঐতিহ্যময় গৌরবময় জীবন কাহীনি, ঢাকা জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৮*

৪৮৭ *আনওয়ার,পৃঃ ৮*

৪৮৮ *সৈয়দা সাবেরা মাসউদ, পৃঃ ১১*

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাপন করিতে থাকেন এবং গায়েবানা জানাযা ও দোয়ায় জন্য মাগফিরাতের সাহায্য তাঁহার পরলোকগত আত্মার মুক্তি ও শান্তি কামনা করেন।[৪৮৯]

সৈয়দা সাবেরা মাসউদ পিতার মৃত্যু পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও চিত্র সম্পর্ক লিখেন-

"আমরা পাগলের মত কাঁদছি। কেঁদেই চলছি মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো। মাওলনা সাহেব তার আর নেই। স্থানীয় লোকজন দলে দলে ছুটে আসছে তাকে একনজর দেখার জন্য আমাদের বোনদের আত্মীয় স্বজনদের সবাইকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা আপারা তখন ছিলেন মাত্র দুজন। তাদের মধ্যে ছিল চাচাজী। গভীর ভালোবাসা। সকালে তিনি এসে পৌছালেন পরপর সবাই এসে গেল। বোনরা, দুলাভাইরা তাদের ছেলে মেয়রো, নানা, খালা, মামারা আত্মীয় স্বজন সে যেখানে ছিল। মৌলানা সাহেবের বাড়িতে তিল ধারণেই ঠাই জায়গা ছিলনা। ওদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে জমা হতে লাগলো। জামআতের লোক, জমঈয়তের লোক, রাজনৈতিক লোক, যেন মানুষের ঢল নেমেছে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছে। হাজার মানুষ এসে জমায়েত হচ্ছে। মৌলানা সাহবের বাড়ির চত্বরে। আমাদের চাচাজী তাঁর প্রিয় ভাইকে অতি যত্নের সাথে শেষ গোসল দিলেন। কাফন পরালেন। .....

লক্ষকোটি জনতার ভালবাসা নিয়ে হাজার মানুষের চোখের পানির মধ্য দিয় আমাদের মহান আব্বাজান শেষ যাত্রা করলেন। আছরের আউয়াল ওয়াক্তে তাঁর দাফন কার্য সামাধা হলো।[৪৯০]

শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারিক শোক সমবেদনা জানিয়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে সব তারবার্ত ও চিঠি পাঠিয়েছেন তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেগম মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীকে লেখা চিঠি....

৪৮৯

তজুমানুল হাদীস, তৃতীয় বর্ষ ১৩৫৮ ৫৯ বঙ্গাব্দ, ১১শ-১২শ সংখ্যা পৃঃ ৪৬৮

৪৯০

আমাদের তিন পুরুষের পৃঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

"মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছাহেব যখন আকস্মিকভাবে হৃদরোগের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্তিকাল ফরমান তখন আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। সুতরাং আপনাকে আরও পূর্বে লিখতে না পারায় দুঃক্ষিত। মাওলানা ছাহাব তাঞার ধর্মপরায়নতা জ্ঞানগরিমা এবং জনসাধারনের কল্যাণের প্রতি গভীর উৎসাহের জন্য জন্য সর্বত্রই শ্রদ্ধা আর্কষণ করতেন। আমি তাঁহাকে দীর্ঘদিন হইতে জানি এবং সর্বদা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি। দেশের এই দুর্দিন ও কঠিন সময়ে রাত্র পারিচালনায় আর তাঁকে সহায়তা পাওয়া যাইবে না। এই ভাবিয়া আমি জমঈয়ত আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাদিগকে এই মহাতি দৃঢ়তার সহিত বহন করিবাবর সাহস ও শক্তি দান করুন।

আপনার বিশ্বস্থ কে - নাজিম উদ্দিন[৪৯১]

পূর্বপাক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন মাওলানা বাকীর পুত্র আব্দুর রহমানকে প্রেরিত তারবার্তায় বলেন "মাননীয় মাওলানা ছাহেবের আকস্মিক ও বেদনাদায়ক মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত। মেহেরবানী পূর্ব আমার গভীর সন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট উহা জ্ঞাপন করুন। আল্লাহর নিকট তাহার মাগফেরাতের জন্য দেওয়া করিতেছি।

ঢাকা-২/১২/৫২ [৪৯২]

পূর্বপাক গভর্ণর ফিরোজখান নূন বলেন, আপনার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন । আল্লাহ আপনাকে এবং মরহুমের উপর অন্যান্য নির্ভরশীলদের এই দুঃখ বহনের শক্তি দান করুন।

ঢাকা-০২/১২/৫২

মরহুদের অগ্রজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী কে সউদি রাষ্ট্রদূত তারবার্তা পাঠিয়ে তাতে বলেছেন, "আব্দুল্লাহিল কাফী, আপনার এবং মরহুমের পরিবার বর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন"

০৩.১২.৫২ [৪৯৩]

৪৯১

মাসিক কর্জুমনুল হাদীস, ৩য় বর্ষ ১১শ, ষংখ্যা ১৩৭২ হিঃ পৃঃ৪৭৬

৪৯২

প্রাগুক্ত ৪৭২

৪৯৩

প্রাগুক্ত-৪৭৫ পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরাম খাঁ মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধ ও শোক প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার চিরদিনের সুহৃদ ও সহকর্মী জনাব মাওলান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী ছাহেবের আকস্মিক ইনতেকালের সংবাদ আমি যে, দারুন আঘাত পাইয়াছি দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ ঘণিষ্ঠতা অদ্ধশতাব্দী ব্যাপী কর্ম জীবনে পরস্পরের সাহচার্য এবং উভয়ের ভাবগত ও আদর্শগত অভিজ্ঞতার দীর্ঘ্য ইতিহাস আজ একে এক স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। এবং মন ও মস্তিকে ক্রমশঃ অধিকতর অবসন্ন করিয়া তুলিতেছে। আল্লাহ আমাদিগকে ধৈর্য ধারণের শক্তিদান করুন এবং মরহুমের আত্মাকে নিজের রহমের পরিবারের গ্রহণ করুন। আমীন রাব্বাল আলামীন[৪৯৪] পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সভপতি মিঃ সুরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত লিখেছেন-

"মাওলানা বাকীর মুত্যু আমার নিকট ব্যক্তিগত আঘাত স্বরুপ। আমারা সহিত মাওলানা বাকীর রাজনৈতিক, মানবিক ও অধ্যাত্মিক যোগসূত্র দীর্ঘ দিনের। আমরা ইভয়েই কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কাজ করিয়াছি এবং একত্রে কারা বরণ করিয়াছি। তাহার আত্মা শান্তি লাভ করুন। এবং তাহার আদর্শ দেশের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলক.....।"[৪৯৫]

শিক্ষাবিদ ভাষাবিদ ডাঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মৃত্যুতে মওতুল আলম আলেমের (বিদ্বানের) মৃত্যুতে আলমের (জগতের) মৃত্যু- বার্কের সত্যতা মর্মে মর্মে অনভব করিতেছি। গত প্রায় ৪০ বছর হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। আঞ্জুমানে ওলামা এ বাংলার সম্পর্কে সেই পরিচয় গাঢ় হয়। আমি মাওলানা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সহনুভূতি জ্ঞাপন করি।"[৪৯৬]

দেশবরেন্য শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ যে শোক সমবেদনা সুদুর আমেরিকার নিউইর্য়াক হতে পাঠিয়েছিলেন তাতে মাওলানা বাকীর প্রতি তাঁর অক্রিত্রিম ভালবাসাই প্রকাশ পায়নি তদসংগে এই লেখনিতে মাওলানা বাকীর জীবনাদর্শ ও জূবন সাধনার এক সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন ও উঠে এসেছে।

নিম্নে তার পত্রটি হুবহু লিখিত হলোঃ

---

৪৯৪ *প্রাগুক্ত, ৪৭৭*

৪৯৫ *প্রাগুক্ত, ৪৭৯ পৃঃ*

৪৯৬ *প্রাগুক্ত-৪৭৯*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মহাপ্রয়াণে পাকিস্তান একটি আসল মানুষ, একটি দরদী সেবক, একটি খাঁটি কর্মী ও একটি আদর্শ আলেম হারাইল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ঈমানম আমল প্রাণের উদরাতা সব গুণই বাকী সাহেবের ছিল। এছলামের শাস্ত্র ও সাহিত্য তিনি মস্তবড় পন্ডিত ছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি কোরআন, হাদীস, দর্শন-সম্বন্ধে কেতাব পড়িতেন। এই সব লইয়াই তিনি সবসময় ভাবিতেন আর সে ভাবনাকে কাজে রূপায়িত করিতে চেষ্ঠা করিতেন। খেলাফত আন্দোলন কালে তিনি খদ্দরের পোষাক ধরেন। আমরাও এইসব খদ্দর পরা শুরু করেছিলাম। আমরা পরে খদ্দর ছাড়িয়া দেই। কিন্তু মাওলানা সাহেব ছাড়েন নাই। ঐ পোষকে কি শ্রদ্ধা জানাইনা। তাহাকে দেখাইতে। সৌম্যমূর্তি, সুন্দর চেহরা, শুভ্র অনাড়ম্বর পোষাক, পন্ডিত্যপূর্ণ আলাপ, যুক্তিসংগত আলোচনা, সত্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা ধর্মের প্রতি গভীর অনুরক্তি, মানুষের জন্য অফুরন্ত দরদ তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া আনেকবার মনে হইয়াছে মরুতাপ ক্লিষ্ট শ্রান্ত পথিকের মরুদ্দ্যান পাইলে তাহার প্রাণ যেমন জুড়াই যায়, আমার ও তেমনি জুড়াই গেল।[৪৯৭]

এদত ভিন্ন দেশ বিদেশের অনেক প্রতিতযশা ব্যাক্তি মাওলানা বাকীর মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠান। মাওলানা বাকীর মৃত্যু পাবনাবাসীদের মনে শোকাকুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তর্জুমানুল হাদীসে এসেছে "পহেলা ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় মরহুমের মৃত্যু সংবাদ পাবনা শহরে ছড়াইয়া পড়িবার সংঙ্গে সংঙ্গে জনসাধারণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। পরদিবস সম্গ্র শহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গায়েবানা জানাযার নামাজের পর টাউনহলে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বদলের বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক মরহুমের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সংগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।" মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর মৃত্যুতে দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তার কিয়দাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

"মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নাল্লিাহে .....)। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশ হইতে একটি উজ্জল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া অকস্মাৎ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর পরলোক গমন-মৃত্যুর এই আকস্মিকতা সমগ্র দেশবাসীকে বিহবল করিয়াছে-

৪৯৭

প্রাগুক্ত-৪৭৯ ও ৪৮০ পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিনা মেঘে অশনি সম্পাতে তাহাদের চেতনা যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে- নিদারুন শোকাঘাতে সকল পাকিস্তানী আজ হতবাক। পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যাথা, শোকের প্রথম আঘাত সব ক্ষেত্রেই অসহনীয় হয়- দেহের সকল স্নায়ু অবসন্ন হইয়া আসে, চিত্তকে বিকল করিতে চায়। কিন্তু যেখানে এই শোকের সম্মুখীন হইতে অকস্মাৎ, সেখানে শোকাহত ব্যাক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে- সাময়িক ভাবে চিন্তা শক্তি যেন লোপ পায়- চেতনা মুর্চ্ছিত হয়।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃভূমি ও ইসলামের সেবা করিয়া মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী দেশবাসীর পরমাত্মীয়ে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পরলোকগমনে- পাকিস্তানীরা এত অভিভুত হইয়া পরিয়াছে- তাই তাহাদের চিত্ত আজ পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যাথায় উদ্বেলিত হইতেছে- সর্বজনমান্য নেতা হওয়া সত্তেও মাওলানা বাকীর মত দেশবাসীর এমন আপনজনা আর কে ছিলেন?

.....মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর পরলোক গমনে রাষ্ট্রের যে ক্ষতির কথা মনে জাগিতেছে ও দেশবাসীর যে শোকাকাতরতা বেদনা বিহবল চিত্তে অবলোকন করিতেছি, তাহাতে ইহাই প্রমানিত হইতেছে যে, মরহুম আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেও তাঁহার স্মৃতি নিয়ত আমাদিকে সম্মুখে চলার-প্রেরণা যোগাইবে। আল্লাহর দরগাহে মরহুমের মাগফিরাতের জন্য মোনাজাত করি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাই।"[৪৯৮]দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীকে এদেশের অন্যতম আলেম আক্ষা দিয়ে লেখা হয়েছে "আমাদের দেশের আলেমদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় কয়জন বাংলাভাষার মাধ্যমে নিজেদের গভীর জড়ানের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কিন্তু তিনি শুধু আলেম ও সাহিত্যসেবীই ছিলেন না; রাজনীতিক এবং সমাজসেবী হিসাবেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলার গত ত্রিশ বছরে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাঁর অচ্ছেদ্য যোগ ছিল।" .....তার মৃত্যু আমাদের কাছে কত বড় শোকাবহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমরা তাঁহার বিয়োগবিধুর পরিজন বর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা, আর তাঁহার পরলোক গত আত্মার জন্য কামনা করি মাগফিরাৎ।"[৪৯৯]

---

[৪৯৮] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৩-৪৮৪*

[৪৯৯] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৫*

Dhaka University Institutional Repository

Morning news পত্রিকায় লেখা হয়েছে, " মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে আমাদের অন্যতম জাতীয় নেতা চিরদিনের জন্য অপসারিত হইলেন।.....'মর্নিং নিউজ' তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।"[৫০০]

তাছাড়া দৈনিক মিল্লাত, নেদায়ে ইসলাম (কলিকাতা), আল ইরশাদ (উর্দু পাক্ষিক), আল এ'তেছাম (উর্দু সাপ্তাহিক) প্রভৃতি পাত্রিকায় মাওলানা বাকীর মৃত্যুতে বিশেষ শোক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।[৫০১]

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম জাগরণে আব্দুল্লাহিল বাকীর অবদান মূল্যায়ন

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী দূরদর্শী আলেম ও সমাজ হিতৈষী ব্যাক্তি ছিলেন। বিশেষত আপন ধর্মাণুসারী মুসলিমদেরকে কল্যাণ চিন্তায় তিনি অস্থির থাকতেন। ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পীষ্ট হয়ে মুসলিম মুসলিম সমাজের যখন ত্রাহী অবস্থা সেই সময় তিনি সংগ্রাম মূখর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় বিভেদ দূর কওে তাদেরকে দায়িত্বশীল ও সমাজ সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় লেখা হয়েছে "তাঁর উদ্দ্যেগে এবং মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মুনিরুজ্জামান এছলামবাদী, ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমূখের সহযোগীতায় ১৯১৩ সালে বগুড়া জেলার বানিয়া গ্রামে আনজুমান এ উলামা এ বাংলা প্রতিষ্ঠাষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল হানাফি ও আহলে হাদীস আলিম গণকে এক মঞ্চে এনে তাঁদের মধ্যকার ধর্মীয় বিভেদ দূর করে এবং মুসলমান গণকে তাদের ধর্মীয় সমাজিক অবস্থান ও সমাজের প্রতি দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।[৫০২] লক্ষ্য অর্জনে মাওলানা বাকী অনেকাংশে সফলতাও

---

[৫০০] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৬*

[৫০১] *প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৬, ৪৮৭*

[৫০২] *মাসিক মোহাম্মাদি, ৩৫ বর্ষ, ১২ শ সংখ্যা আশ্বিণ ১৩৭১, পৃঃ ৮৭৯*

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেছেন। মাওলানা বাকী আনজুমাননের বিভিন্ন কর্মে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৫০৩] আনজুমান এর মুখপাত্র আল এসলাম মুসলিম সমাজওে জাগরণ ও মুসলিম জাতীয়বাদের উম্মেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫০৪]

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ছিলেন আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক ছিলেন। মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তার এ কর্মকান্ডের পেছনে নিজের কোন উচ্চাঙ্খাকা কিংবা লৌকিকতা চমিাত্র ছিলনা। মাসিক তর্জমানুল হাদীসে লেখা হয়েছে, "সস্তা জনপ্রিয়তা তিনি কোন দিনই কেউ কামনা করেন নাই। সভায় গরম বক্তৃতা হাঁকিয়ে অথবা পত্রিকার পৃষ্ঠার ফাঁকা বিবৃতি ঝাড়িয়ে নাম কামানোর ব্যাতিক তাহার কোন দিনই ছিল না। কথা বলিতেন তিনি অল্প। প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া বলিতেন কিন্তু কাজ করিতেন অনেক বেশি"।[৫০৫]

মাওলানা আব্দুলল্লাহিল বাকী জড়াগস্থ মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে আবেগময়ী বক্তৃতা দিতেন। সেসব বক্তৃতা শুনে অবচেতন দিশাহারা মুসলিম সমাজ চেতনায় নতুন দিগন্ত খোঁজে পেত। প্রসঙ্গত ১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তদানিন্তন ময়মনসিংহ জেলার টারাইশের ভেংগুলা গ্রামে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মিলনীতে মাওলানা বাকীর বক্তৃতা সম্বন্ধে সুসাহিত্যিক ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "সভাপতি হিসাবে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সাহেব খুব সারগর্ভ সুচিন্তিত অভিভাষণ দিয়েছিলেন।"[৫০৬]

মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ছিলেন আপোষহীন ও অকুতভয় এক বীর সেনানী। ১৯০৯ সাল থেকে স্বীকৃত সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচন সব্যবস্থাপক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনভাবেই মেনে নেয় নি। ১৯৩০-১৯৩২ সালে লন্ডনে তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে এর কোন আপোষ না হওয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালের আগস্ট 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) ঘোষনা করেন, এর ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে

৫০৩

আরাফাত, ঢাকা ৩০ মে ১৯৬৬

৫০৪

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর রাজনীতিতে কাফী উলামার ভূমিকা পৃঃ ১৪৪

৫০৫

মাসিক তজুমানুল হাদীস তৃতীয় বর্ষ ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, পৃঃ৪৬৯

৫০৬

আবুল মনসুর আহমদ , আমার দেখা..... পৃ: ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ভারত শাষন আইন পাশ করে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে। সাম্প্রদায়িক রোয়দাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে এর বিলুপ্তির দাবিতে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সম্মেলন আহবান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়।[৫০৭]

১৯ থেকে ২১ এপ্রিল তিনদিনের অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক রোয়াদাদ বাতিল। হিন্দু প্রতিনিধিরা একচেটিয়া ভাবে রোয়াদাদ বাতিলের পক্ষে ভোট দিলে ব্যাপক হৈ চৈ-র মধ্যে মাওলানা বাকীর নেতৃত্বে সমস্ত মুসলিম প্রতিনিধি সভা বর্জন করে কংগ্রেস দল ত্যাগ করার হুমকি প্রদান করলে অবশেষে উক্ত প্রস্তাব পরিত্যাক্ত হয়।[৫০৮]

দেশ ও দেশের মানুষের চাওয়া পাওয়ার সাথে তিনি ছিলেন আজীবনকাল একত্ম। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের টাল-মাটাল দিনগুলোতে ও দেখা যায় মায়ের ভাষার ভালবাসার টানে তিনি ছুটে এসেছেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর জেলা রোড প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভায় গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি বলেন,

"আমি কি বাঙ্গালী মায়ের সন্তান নই? বাংলা কি আমার মুখের ভাষা নয়? আমি কি কংগ্রেস আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, কৃষক প্রজা পার্টির আন্দোলন এমনকি বৃটিশ খেদঠর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করি নাই? এতে কি আমার কোন অবদান নাই। আর সেসব আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে গিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই নাই এবং নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হই।" তিনি আরোও বললেন যে,

"আব্দুল্লাহিল বাকী ছিল আপনাদের দরকারে অদরকারে আপদে বিপদে, সহায়তা ও সহযোগিতায় সঙ্গী সেই আব্দুল্লাহিল বাকী বাদ দিয়ে কি করে এই ভাষা আন্দোলন? তাই আমি আপনাদের ডাক না পেয়েও স্বেচ্চায় ছুটে এসেছি এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি।"[৫০৯] তার

৫০৭

ড. মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দিনাজপুরের ইতিহাস, পৃ: ১০৩,১০৪

৫০৮

ড. মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত: পৃ:১০৪

৫০৯

মেহরাব আলী, পৃ: ২১১, দিনাজপুর ইতিহাস সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য চর্চা ও লেখনীর মূল বিষয় ইসলাম ধর্মতত্ত্ব হলেও তার মধ্যে মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহমুখী করে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার সুরধ্বনিত হতে দেখা যায়।

তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে পূজীভূত অন্ধকার দূর করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সঠিক আকীদায় পরিপুষ্ট করে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম সমাজ গঠনে অনবদ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

তিনি 'সুদী হোসায়েন এবন মনসুর হাল্লাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন, তাহার লিখিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলি নির্বুদ্ধিতা, বিপরীত উক্তি এবং ভীষণ কোদরের কথায় পরিপূর্ণ। একটা পুস্তকে লিখিত ছিল- আমিই নূহের উম্মতকে নিমজ্জিত করিয়াছি, আমিই সাদ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি।[৫১০]

পীরের ধ্যান পুস্তিকায় তাছাউওয়ারে শায়েখ বা মনোজগতে পীরের মূর্তি কল্পনা করে ভক্তি অর্চনা করা সম্পর্কে লিখেছেন, "রসূলে করিম(সাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাব-এ-তাবেয়ী এবং ইমাম মহোদয় গণের মধ্যে কেহই এরূপ কার্য করেন নাই, অন্যকেও করিতে বলেন নাই। শরীয়ত অভিজ্ঞ প্রকৃত ছুফী এবং সাধকবৃন্দের মধ্যে কেহই এই কর্ম করেন নাই এবং মুরিদগণকেও ইহা করিতে আদেশ দেন নাই।"[৫১১]

তিনি ছিলেন মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষায় একজন সতর্ক প্রহরী। তার লেখনীতে ছাপ ও যথেষ্ট লক্ষনীয়। তার লেখনীতে সে বিষয়টির ছাপও যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়। হিন্দু কতিপয় লেখক কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন লেখনীর জবাবে তিনি 'অনধিকার চর্চা' প্রবন্ধ লিখেন,"অনধিকার চর্চা যতই অন্যায়, অনিষ্টকর ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হউক না কেন আমাদের কোন কোন হিন্দু লেখক তাহাতে খুবই সিদ্ধ হস্ত। বিশেষত মুসলমানদের সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করিতে তাহাদের আগ্রহের তুলনা নাই।"[৫১২]

মুসলমানদের উন্নতি ছিল মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকির স্থির লক্ষ্য। সে লক্ষ্যবস্ত থেকে জীবনের কোন অংশেই তিনি বিচ্যুত হননি। মাসিক তর্জুনামুল হাদীসে মাওলানা মরহুমের স্মরণ সংখ্যায়

---

৫১০ *আল-এসলাম, ৩য় ভাগ ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪, পৃ: ৬৩১*

৫১১ *আব্দুল্লাহিল বাকী আল কোরায়শী (রহঃ), আবুল হাছান মোহাম্মদ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেঃ ১৯৫৫, পাবনা, পৃ:৩*

৫১২ *আল ইসলাম, চৈত্র ১৩২৪, ৩য় ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ৪৩৩ পৃ:*

Dhaka University Institutional Repository

লেখা হয়েছে,"যৌবনে প্রারম্ভেই দেশ ও সমাজের কাজে তিনি ঝাপাইয়া পড়েন। আলেম সমাজের দ্বারা যে দেশের প্রভূত কল্যান সাধিত হইতে পারে তিনি তাহার কর্মময় জীবনের দ্বারা তাহার বলিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপিত করেন।"

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর দেশের প্রতিটিআন্দোলনে তিনি শুধু সাধারণভাবে অথবা নামকে ওয়াস্তেই জড়িত ছিলেন না বরং প্রত্যেকটি আন্দোলনের পুরো-ভাগে দাঁড়াইয়া তজ্জন্যে অশেষ ত্যাগস্বীকার ও অর্ঝণীয় দুঃখ ও ক্লেশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লন। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা হইতে শুরু করিয়া খেলাফত, কংগ্রেস ,জমাঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ, কৃষকপ্রজা ও সর্বশেষ মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান-প্রত্যেকটি আন্দোলনই তাহার বিডশিষ্ট অবদানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।[৫১৩] বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, "নিখিল বংগ প্রজাসমিতি বাংলার দরিদ্র মুসলিম সমাজকে সংঘবদ্ধ ও উন্নত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এটি ক্রমে বাংলার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।"[৫১৪] আবার আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "কাজেই বাংলার প্রজা-আন্দোলন মূলত: এবং প্রধানত হিন্দু সামন্ত-তন্ত্রের বিরূদ্ধে মুসলিম মধ্যবিত্তের আন্দোলন।"[৫১৫] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রজালীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুখ্য মন্ত্রী হন। অন্য দিকে তিনি মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা সমিতি উভয়টির সভাপতি থেকে যান। পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যেই বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেল।[৫১৬] কৃষক প্রজা পার্টির এমন দুর্দিনে জনদরদী নেতা মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীকে এর সভাপতি করা হয়। আবুল মনসুর আহমদ বলেন,"আমরা কৃষক প্রজা পার্টির ঝান্ডা খাড়া রাখবার চেষ্টা করিয়া হক সাহেবের স্থলে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীকে সভাপতি করিলাম।"[৫১৭] মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী বাংলার মুসলমানদের উন্নতি চিন্তা ও

---

৫১৩ *মাসিক তর্জুনামুল হাদীস, ৩য় বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা, পৃ:৪৭০*

৫১৪ *ড. মহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ:১০১*

৫১৫ *আমার দেখা.. পৃ:১৩৯-১৪০*

৫১৬ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ:১৩৮*

৫১৭ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ:১৪০*

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে কখনো পিছপা হন নি। তার চিন্তা চেতনা রাজনৈতিক পদচারণা সাহিত্য সাধনা সবকিছু জুড়েই ছিল বাংলার মুসলমানদের জাগিয়ে তুলার গঠনমূলক কর্ম প্রয়াস।

উপসংহার

১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে অমানিশা নেমে এসেছিল । ধর্মীয় স্বাতন্ত্র ও বৃটিশদেরকে দখলদার নিপীড়ক ভাবনা থেকে মুসলমানগণ নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেন বহুদিন। এতে তারা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ও সামাজিকভাবে অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রয়াসী হয় । সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এসব বিষয়ে তাদের মধ্যে নবতর চিন্তার উদ্রেক হয় । পুরাতন ও জরাজীর্ণ চিন্তাকে পিছনে ফেলে নতুন ভাবনা নিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো গ্রহণ করে নিজেদের নতুনভাবে সাজাতে চেষ্টা করে। তাদের ইতিবাচক মনোভাব ও শান্তিপূর্ণ পদচারণা তাদরেকে স্বকীয় আসনে বসাতে সাহায্য করে । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলমানরা আপন অধিকার সচেতন ও অনেকাংশে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে উঠে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে অবলম্বন করে হলেও স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তারা এগিয়ে আসে।

মুসলিম সমাজের সচেতন, স্বদেশপ্রেমিক এবং অগ্রসর বুদ্ধিজীবীবর্গ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে যারা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর ভূমিকা অনন্য স্বকীয়তায় উজ্জল । স্বজাতি মুসলমানদের অধিকার আদায়, মুসলিম ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার , চিন্তার

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্রবোধ ইত্যাদি মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর আজীবনের কর্মে দৃশ্যমান। তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জীবনের বেশিরভাগ অংশ কাটিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে। তিনি ধর্মের নামে অধর্মের ছড়াছড়িকে মনোপ্রাণে ঘৃনা করতেন। তিনি অশিক্ষিত ধর্ম ব্যবসায়ী, পীর পুরোহিতদের অনাচার থেকে সমাজকে রক্ষার চেষ্টা চালিয়েছেন।

তিনি ধর্মে অটল , কর্মে নীতি ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন । কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিনির্মিত আদর্শ সমাজই দেশ ও জাতিকে প্রকৃত শান্তি এনে দিতে পারে এইছিল তার বিশ্বাস। তিনি লেখনীতেও যথেষ্ঠ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তার লেখনী আবেগ বর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ঐতিহ্যের উদাহরণ তুলে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

বাংলার মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে তাঁর মত ক্ষণজন্মা পুরুষ খুব কমই দেখা গেছে । তিনি ছিলেন স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী আজীবন আদর্শবাদী নেতার এক প্রতিচ্ছবি। মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আল-কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের বিশুদ্ধতার দিকটি অশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি শিরক ও বিদআতের আচ্ছন্নতাকে ভেদ করে ধর্মের আসল রূপ তুলে ধরতে অদম্য প্রায়াসী ছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা ও পীর পুরস্তির কুহেলিকায় আবিষ্ট নিজ ধর্মীয় মানুষজনকে আজীবন তিনি বিশুদ্ধ চিন্তা ও চেতনার ছবক দিয়েছেন।

তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েও অন্যান্য মৌলভী মাওলানার মত মসজিদ-মাদরাসার চিরায়ত গন্ডীতে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতির উষ্ণ ময়দানে পা রেখে দেশের মানুষের মুক্তির জয়গান গেয়ে গেছেন। একটি স্বাধীন দেশের আজীবন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দৃঢ়পদে সামনে এগিয়ে গেছেন। স্বধর্মীয়দের অন্তবিরোধকে রুখতে যৌবনের উষালগ্নেই হিম্মত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আঞ্জুমান উলামায়ে বাঙালা (১৯১৩) প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ্য পূরণে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। হিন্দু ও খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি আল এসলাম, মাসিক মুহম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায় ইসলাম ধর্মীয় ও মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

জাতির সার্বিক কল্যাণ চিন্তায় তিনি ছিলেন একান্ত নিবেদিতপ্রাণ। বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করতে ১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলনের সূচনা যারা করেছিলেন তাদের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। সেই খেলাফত আন্দোলনই আযাদী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে পর্যবসিত হয়ে উপমহাদেশের আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে ১৯৪৭ সালে আযাদীর স্বপ্ন পূরণ হয়।

অভিজাত পরিবার থেকে এসে জীবনের সর্বস্তরে তিনি আপন ঐতিহ্যকে ধারণ করেই যশ ও খ্যাতিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি থাকা কালে এবং ১৯৪৭ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি থাকা কালে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে ভাষা আন্দোলনে একাত্ম হয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতার আসনও অলংকৃত করেছেন।

একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ ও জাতিসত্বা বিনির্মাণে তার অবদান অনস্বীকার্য ও অতুলনীয়। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত এই মনীষীর জীবন ও কর্ম জানার মাধ্যমে আমরা অধিকতর দেশ প্রেমের স্বাক্ষর রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হব।

পরিশিষ্টঃ ১

জীবনপঞ্জি

জন্ম	ঃ	বর্ধমান জেলার রসূলপুর পরগনার টুবগ্রামে আপন মাতুলালয়ে, মে-১৮৮৮ সালে জন্ম। (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫)
পিতা	ঃ	সৈয়দ আব্দুল হাদী।
মাতা	ঃ	উম্মে সালমা।
প্রাথমিক শিক্ষা	ঃ	পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদী ও লালবাড়ি মাদরাসায়।
১৮৯৬	ঃ	ভারতের কানপুরে জামেউল উলুম মাদরাসায় ভর্তি ও ১০ বছর অধ্যয়ন।
১৯০৬	ঃ	পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদীর মৃত্যু।
১৯০৬	ঃ	উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস জামাআতের নেতৃত্ব লাভ।
১৯০৮	ঃ	মামত বোন জাহরা খাতুনের সাথে বিবাহ।
১৯১৩	ঃ	আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৪ ঃ বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুর নিবাসী মাওলানা সাইফুল্লাহর কণ্যা সফুরা খাতুনের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ।

১৯১৫ ঃ আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালার মুখপাত্র 'আল এসলাম' প্রকাশে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন।

১৯১৯ ঃ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান।

১৯২১ ঃ পবিত্র হজ্জব্রত পালন।

১৯২২ ঃ মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯ ঃ ইউনিয়নবোর্ড ইলেকশনে পলাশবাড়ী ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

১৯২৯ ঃ বগুড়া জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব গ্রহণ।

১৯৩০ ঃ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ।

১৯৩২ ঃ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দ্বিতীয়বার কারাবরণ।

১৯২৭ ঃ কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগদান।

১৯৩৩ ঃ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা আন্দোলনে যোগদান।

১৯৩৪ ঃ প্রজা পার্টি হতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৩৭ ঃ নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাপার্টির সভাপতি।

১৯৩৯ ঃ প্রজাপার্টির সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৪০ ঃ দিনাজপুরে কৃষক প্রজা আন্দোলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৩ ঃ প্রজাপার্টি হতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৫ ঃ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বরেন্দ্র নেতা আজাদ সোবহানীর দিনাজপুর সভায় সভাপতিত্ব।

১৯৪৬ ঃ মুসলিম লীগে যোগদান।

১৯৪৬ ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৭ ঃ পাকিস্তান গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লমেন্টারী বোর্ডের সদস্য মনোনীত।

১৯৪৭ ঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহসভাপতি ও পরে সভাপতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ ঃ ভাষা আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা।

১৯৫২ ঃ পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫২ ঃ ডিসেম্বর **১৯৫২**, বার রবিউল আউয়াল মৃত্যু।

পরিশিষ্টঃ ২

মাওলানা বাকী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ছবি

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী (১৮৮৮-১৯৫২)

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুর সরকারী কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), প্রতিষ্ঠিত- ১৯৪২, প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও অনুজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীর বৈঠকঘর

Dhaka University Institutional Repository

দুর্লভ বহু গ্রন্থ সমৃদ্ধ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও অনুজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীর ব্যবহৃত পাঠকক্ষ

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ব্যবহৃত কুয়া

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর কবরস্থল খেজুর চারার নিচে

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডাকঘর

Dhaka University Institutional Repository

নূরুল হুদা উচ্চ বিদ্যালয় যা ছিল মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ স্কীম মাদ্রাসা

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খোলা হাটি রেল স্টেশন

মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল হাদী মুহাম্মদ আন্ওয়ারের সাথে গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. থিসিস

১. মিয়াজী, মোঃ আতাউর রহমান: বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী ঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান ঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা - একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, জুন ২০০৭, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত) ।

২. হক, ড. মুহাম্মদ আব্দুল, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরাইশী (রহঃ) এর জীবনী; সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পি.এইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান: নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণীঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, মে ২০১৩, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৪. নাহার, শামসুন: বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ সাময়িক পত্রের ভূমিকা (১৯০৬-৪৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, আগস্ট ২০০২, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত) ।

5. Ahsan, Rana Razzaque: Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947), Dept. of History, University of Dhaka, March 1997.

অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস

৬. বানু, আলো আরজুমান: মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)ঃ তার ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০২, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত) ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আক্তার, তৌফিকা: বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তায় মুসলিম নারী ও ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, জানুয়ারি ২০০২, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত) ।

৮. আহমদ, ইমতিয়াজ: বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর ২০০০, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঢা.বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত) ।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. আনওয়ার, আব্দুল হাদী মুহাম্মদ :আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী: সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রথম প্রকাশ: ২০০৬।

২. আহমদ, ওয়াকিল: বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

৩. আব্দুল্লাহ্, আবুল কালাম মুহাম্মদ: বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৯।

৪. আহ্মদ, কামরুদ্দীন: পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, মার্চ ২০০২।

৫. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ: বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

৬. আবদুল্লাহ, কাজী আবু মোহাম্মদ: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, নিউ লাইট পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৭ ।

৭. আহমদ, ওয়াকিল: উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮. আহমদ, ড. এ.বি.এম শামসুদ্দীন: বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ১/১ মিরপুর রোড, হযরত শাহজালাল মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাক-১২০৫।

৯. আহমদ, আবুল মনসুর: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

১০. আহমদ, কামরুদ্দীন: বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, সুশোভন ই. শাওন, ৪৬ বাংলাবাজার/২য় তলা, ঢাকা-১১০০।

১১. আহমদ, ওয়াকিল: বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৫।

১২. ইসলাম, প্রফেসার সিরাজুল: বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, চয়নিকা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০। প্রথম প্রকাশ: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

১৩. হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, বাংলার ইতিহাস (ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপূর্ব), বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৯।

১৪. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল: বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ (ঢাকা-কলকাতা কেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক), কথামেলা প্রকাশন, ৩৮/৪, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০০৭ ।

১৫. সাগর, খুরশীদ আলম : পলাশী প্রান্তর থেকে বাংলাদেশ (১৭৫৭-১৯৭১) ও আমাদের স্বাধীনতা, শোভা প্রকাশ, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, একুশ বইমেলা, ২০০৪।

১৬. সাহা, দিলীপ কুমার ও অন্যান্য: বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত), সৌরভ প্রকাশন, ই-১৫, নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯১০০, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০০৪।

১৭. মল্লিক, অধ্যাপক সমর কুমার: আধুনিক ভারতের রূপান্তর (রাজ থেকে স্বরাজ), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪, কলেজ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯।

১৮. হবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ: সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. মোহাম্মদ, কাজী দীন: জীবনী গ্রন্থমেলা, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

২০. মামুন, মুনতাসীর: ঢাকা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

২১. রহমান, ড. মো. মাহবুবুর: বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৯৪৭-৭১), সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯৯।

২২. রহিম, ডঃ মুহম্মদ আব্দুর ও অন্যান্য: বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

২৩. চ্যাটার্জী, জয়া: বাঙলা ভাগ হল (হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা.এ. ঢাকা-১০০০।

২৪. জাহান, মোঃ এমরান: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও সংবাদপত্র, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০০৮।

২৫. হান্টার, উইলিয়াম: দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

২৬. উমর, বদরুদ্দীন: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

২৭. খাঁ, খান বাহাদুর আলহাজ্ব আবদুর রহমান, আমার জীবন, ঢাকা, ১৯৬৪।

২৮. খান, ড. মুঈনউদ্দীন আহমেদ: ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৯।

২৯. করিম, আবদুল: বাংলাদেশের ইতিহাস (মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), বড়াল প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩০. মিহ্‌র, গোলাম রসূল: মাওলানা আবুল কালাম রচনাবলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩১. হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল: ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. রহিম, এম.এ: বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মে ২০০৫।

৩৩. হোসেন, দিলওয়ার: মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, , প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

৩৪. হক, মেসবাহুল: পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ,

৩৫. মজুমদার, রমেশচন্দ্র: বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০০১।

৩৬. ঘোষ, বিনয়: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০, বুক ক্লাব, ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৮।

৩৭. ঘোষ, বিনয়: বাংলার নবজাগৃতি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯।

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর: পলাশি থেকে পার্টিশন, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৭২।

৩৯. মামুন, মুনতাসীর: উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ,ডানা পাবালিশার্স, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।

৪০. হোসেন, ড. আশরাফ: বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপকথা, জে.কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

৪১. হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫।

৪২. মামুন, মুনতাসীর: উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (দশম খন্ড), অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।

৪৩. মনির, শাহজাহান: বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৩।

৪৪. খান, মোঃ জামান: বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. রেহমান, তারেক শামসুর: বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর, বুকস ফেয়ার, ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ।

৪৬. শামাসুদ্দীন, আবুল কালাম: অতীত দিনের স্মৃতি, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ ।

৪৭. মুরশিদ, গোলাম: হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০৬ ।

৪৮. আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম:ভারত স্বাধীন হল, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৭২, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৯ ।

৪৯. জাফর, আবু: রাজভবন থেকে বঙ্গভবন, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ২০০৬ ।

৫০. গফুর, আবদুল: আমার কালের কথা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০০ ।

৫১. সিংহ, যশোবন্ত: জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়টোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৯।

৫২. হোসেন, মীর মোশাররফ: আমার জীবনী (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: *১লা আশ্বিন, ১৩১৫ সাল (বাংলা) ।*

৫৩. শামসুদ্দীন, আবুল কালাম: পলাশী থেকে পাকিস্তান, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০০ ।

৫৪. হক, ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল: ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০০৩।

৫৫. আলী আহসান, মুহম্মদ আবদুল হাই সৈয়দ: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৯।

৫৬. এসলামাবাদী, মৌলানা মনিরুজ্জামান (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. চৌধুরী, হাসান আলী: ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, এস.এন. প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯৩ ।

৫৮. আবাদী, মুহাম্মদ সোলায়মান ফররখ: কারবালা থেকে বালাকোট, প্রতীকি প্রকাশন, ৮৮/১ মনেশ্বর রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৫, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮৭ ।

৫৯. ড. তারাচাঁদ: ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৮৮ ।

৬০. আহমদ, শাহাবুদ্দীন: বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা, প্রথম প্রকাশ: মে, ২০০০ ।

৬১. হক, মেসবাহুল: পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৭ ।

৬২. কিসমতী, জুলফিকার আহ্মদ: আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা, আল্-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০০০ ।

৬৩. করিম, সরদার ফজলুল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরান পল্টন, ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৩ ।

৬৪. খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম: মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০২ ।

৬৫. মওদুদ, আবদুল: মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৯ ।

৬৬. আহমেদ, সুফিয়া: বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০২ ।

৬৭. হোসেন, দিলওয়ার: বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬) , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮২ ।

৬৮. মোজল্, লিওনার্দ: ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ১৯৭৭ ।

৬৯. মামুন, মুনতাসীর: উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭০. ওয়াহিদ, ড. আবদুল: বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০১।

৭১. মাহমুদ, হোসেন: বাঙালি মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০০৭।

৭২. আলীম, এ. কে. এম. আবদুল: ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৯।

৭৩. মাহফুজউল্লাহ্, মোহাম্মদ: বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।

৭৪. আহমদ, আবুল মনসুর: বাংলাদেশের কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৬।

৭৫. ইসলাম, সিরাজুল: বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (প্রথম খন্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

৭৬. ইসলাম, সিরাজুল: বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

৭৭. ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া: বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৫।

৭৮. ইসলামী বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খন্ড)

৭৯. আসাদ, আবুল: এক'শ বছরের রাজনীতি, বাংলাদেশ কোঃ-অপারেটিভ কুব সোসাইটি লিঃ চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণঃ আগস্ট, ২০০৫।

৮০. সিদ্দিকী, আনিস: সিপাহী যুদ্ধের ট্র্যাজেডী, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০০৫।

৮১. মুস্তাফা, গোলাম: বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল, সন্দেশ, বইপড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০০৫।

৮২. আবদুল্লাহ, ড. মোঃ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ১৮০১-১১৭১, ই.ফা.বা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. ফারুকী, রশীদ আল: বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

৮৪. আলী, মেহরাব : দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দেলনের ইতিহাস।

৮৫. ভট্টচার্য, শ্রীনৃপেন্দ্র: বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৭২। প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৬১।

৮৬. হোসেন, দিলওয়ার সম্পাদিত,মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

৮৭. ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া: বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৫।

৮৮. খান, নূরুল ইসলাম: বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংস্থাপন মন্ত্রণালায়, ঢাকা ১৯৯১।

৮৯. আশরাফ, সৈয়দ আলী: বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট, ১৯৮০।

৯০. খাঁ, ইবরাহীম : বাতায়ন, বাংলা একাডেমী,বর্ধমান হাউস, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৬৭।

৯১. নূরী ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, বাংলার মুসলিম নবজাগরণ (১৯০৫-১৯৪৭),খাইরুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী,২০০৬।

৯২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), প্রতিভাস কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯ ।

৯৩. হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, আগষ্ট ২০০৮।

৯৪. কে.এম. মহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পূর্বোক্ত, ১ম প্রকাশ ডিসেম্ববর ২০০৭।

৯৫. মাসউদ, সৈয়দা সাবেরা, আমাদের তিন পুরুষের ঐতিহ্যময় গৌরবময় জীবন কাহিনী, ঢাকা, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. উদ্দিন, মুহাম্মদ আদম, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড।

৯৭. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়রী ২০০৯।

৯৮. বাকী, মাওলানা আব্দুল্লাহ্, পীরের ধ্যান, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পাবনা।

৯৯. হোসেন, সেলিনা ও ইসলাম, নূরুল সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

Published Books

100. *W.W. Hunter B.A. LL.D. : The Indian Musalmans, 15 Banglabazar, Dacca-1100, Bangladesh , First Bangladeshi Edition: June, 1975.*

101. *Sirajul Islam: History Of Bangladesh 1704-1971, Asiatic Society of Bangladesh, First Published: September, 1992.*

102. *Rahim, Muhammad Abdur: The Muslim Society and Politics in Bengal, Published by- The University of Dacca . First Edition- November, 1978.*

103. *Mallick, Azizur Rahman: British Policy Muslims in Bengal 1757-1856, Published by- Bangla Academy , Dacca , First Edition- 1977.*

104. *lslam, Sirajul : The Permanent Settlement in Bengal, A Study of Its Operation 1790 -1819, Published by- Babgla Academy, Dacca, First Edition- May, 1979.*

105. *Ahmad, Kamaruddin: A Socio Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh , First Edition- April, 1967.*

106. *Huque,Kazi Anwarul: Under Three Flags , First Edition- September, 1986.*

107. *Khan ,Dr Muin-Ud-Din Ahmad :History of the Fara'idi Movement , Published by-Islami Foudation Bangladesh, First Edition- October , 1984.*

108. *Rashid, Harun-Or :The Foreshadowing of Bangladesh (Bengal Muslim league and Muslim politics 1936-1947), Published by-Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka , First Edition: 1987.*

Dhaka University Institutional Repository

109. *Ikram, S.M. :Modern Muslim India and The Birth of Pakistan (1858-1951), Published by- Sh Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan), First Edition: 1950.*

110. *Gopal, Ram : Indian Muslims A Political History (1858-1947), Published by- Asia Publishing House , First Edition: 1959.*

111. *Malik, Hafeez : Moslem Nationalism In India and Pakistan, Published by- Public Affairs Press, Washington, D.C, First Edition: 1963.*

112. *Ahmed, Rafiquddin:The Bengal Muslims (1871-1906) A Quest for Identity, Published by- Delhi Oxford University Press, First Edition: 1981.*

113. *Qureshi, Ishtiaq Husain: The Muslim Community of The Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947) A Brief Historiocal Analysis , Published by- Mouton & Co. Publishers, First Edition: 1962.*

114. *Akanda, Latifa ,: Social History of Muslim Bengal, Published by-Islamic Foundation Bangladesh , First Edition- May 1981.*

115. *Ahmed, Sufia: Muslim Community in Bengal 1884-1912, Published by- Oxford University Press Bangladesh, First Edition: November , 1974.*

116. *Aziz , K.K. :Ameer Ali, His Life and Work , Publishers United Ltd, 176, Anarkali , Lahore 1968.*

117. *Chowdhury Khalequzzaman: Pathway to Pakistan , Lahore 1961.*

118. *Shila Sen: Muslim Politics in Bengal(1937-1947), First Published , New Delhi, 1976.*

119. *Mohammad, Siraj, Mannan: The Muslim Political Parties i n Bengal (1936-1947): A Study of their Activities and Struggle for Freedom,Published by - Islamic Foundation Bangladesh , Dhaka 1987.*

120. *Ray, Rajat Kanta: Social Conflict and Political Unrest in Bengal (1875-1927) , Oxford University Press , Delhi 1984.*

পত্রপত্রিকা ও দলীলপত্র

Dhaka University Institutional Repository

১২১.আহমেদ, ওয়াকিল: ইতিহাস , বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, চুয়াল্লিশ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০১০।

১২২.আহমেদ, ওয়াকিল: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭।

১২৩.রেজা, সৈয়দ হাশিম: শেরে বাংলার ইন্তিকালে, মাহে নও, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৯ ।

১২৪.চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

১২৫.সাপ্তাহিক আরাফাত, জুন-৬; ১৯৬৬।

১২৬.মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ঃ ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ৩য় বর্ষ।

১২৭.আল এসলাম, ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ বিভিন্ন সংখ্যা।

১২৮.Report on the progress of Education in Estern Bengal and Assam. Op. cit.

Dhaka University Institutional Repository